স্বামীজীর কথা

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স লিঃ
২০-এ, গৌর লাহা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

চতুর্থ সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৬২

দুই টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্যলাভ যাঁহাদের হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের, স্বামীজী-সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পুরাতন 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছিল। তাহাই বর্ত্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে ও পরে স্বামীজীর জীবনের অনেক নূতন তথ্য পাঠক ইহাতে দেখিতে পাইবেন।

ইতি

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

প্রকাশক

নিবেদন

(চতুর্থ সংস্করণ)

এই সংস্করণে শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন ও মিস্ জোসেফাইন ম্যাক্লাউড-লিখিত স্বামীজীর স্মৃতি সংযোজিত হইল। এগুলিও পুরাতন 'উদ্বোধন' হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ভাদ্র, ১৩৬২

প্রকাশক

সূচীপত্র

খ্রীষ্টান মিশনরীরা এই সময়ে আমার নিকট যাওয়া-আসা করিতে লাগিলেন। অন্য ধর্ম্মের নিন্দাবাদ, এবং দাঁও-প্যাচের সহিত অনেক তর্ক-যুক্তি করিয়া অবশেষে তাঁহারা বুঝাইলেন যে, বিশ্বাস ভিন্ন ধর্ম্মরাজ্যে কিছুই হইবে না। খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করাটা পূর্ব্বে আবশ্যক, তবেই উহার নূতনত্ব ও অন্য সকল ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব—বুঝা যাইবে। অদ্ভুত গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সে কথায় কিন্তু পাষণ্ডের মন গলিল না। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার কৃপায় শিখিয়াছি, "প্রমাণ ভিন্ন কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না।" মিশনরী প্রভুরা কিন্তু বলিলেন, "অগ্রে বিশ্বাস, পরে প্রমাণ।" কিন্তু মন বুঝিবে কেন? সুতরাং কথার জোরে তাঁহারা কোনমতে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা বলিলেন, "বাইবেল মন দিয়া সমস্ত পড়া আবশ্যক; তাহা হইলেই বিশ্বাস হইবে।" আচ্ছা, তাহাই করিলাম। ভাগ্যক্রমে ফাদার রিভিংটন, রেভারেণ্ড লেট্‌ওয়ার্ড, গোরে ও বোমেণ্ট প্রভৃতি কতকগুলি বিদ্বান্ নিস্পৃহ ও বাস্তবিক ভক্ত মিশনরীরও সাক্ষাৎ-লাভ হইল; কিন্তু কোনরূপে খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "আমার অনেক উন্নতি হইয়াছে, ঈশার ধর্ম্মে বিশ্বাসও হইয়াছে, কিন্তু জাতি যাইবার ভয়ে খ্রীষ্টান হইতেছি না।" তাঁহাদের সে কথার ফলে ক্রমে অবিশ্বাসের উপরও সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। অবশেষে এই স্থির হইল যে, তাঁহারা আমার দশটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন এবং প্রত্যেক প্রশ্ন যথাযথ সমাধানের পর আমার স্বাক্ষর লইবেন। এইরূপে যখন ১০ম প্রশ্নের উত্তরে আমি স্বাক্ষর করিব তখনই আমার হার হইবে এবং তাঁহারা আমাকে ব্যাপ্‌টিস্‌ম্ (baptism) দিবেন বা তাঁহাদের ধর্ম্মে অভিষিক্ত করিবেন। বলা বাহুল্য, তিনটির অধিক প্রশ্নের সমাধান হইবার পূর্ব্বেই কলেজ ছাড়িয়া আমি সংসারে প্রবেশ করিলাম। সংসারে ঢুকিবার পরেও

সকল ধর্মগ্রন্থাদিই পড়ি, কখন বা চার্চে, কখন বা ব্রাহ্মমন্দিরে, কখন বা দেবালয়ে যাই; কিন্তু কোন্ ধর্ম সত্য, কোন্ ধর্মই বা অসত্য, কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টিই বা মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে স্থির হইল যে, পরলোক আছে কি-না, আত্মা অমর কিংবা মর, এসকল কথা কেহই জানে না। তবে যে-কোন ধর্মেই হউক না কেন দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারিলে ইহজন্মে অনেকটা সুখ-শান্তি থাকে। আর সেই বিশ্বাসটা মানুষের অভ্যাসেই দৃঢ় হইয়া থাকে। তর্ক, বিচার বা বুদ্ধির দ্বারা ধর্মের সত্যাসত্য বুঝিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। ভাগ্য অনুকূল—প্রচুর বেতনের চাকরিও জুটিল। তখন আমার অর্থেরও অনটন নাই, দশ জন লোকেও ভাল বলে; সুখী হইতে গেলে সাধারণ মানুষের যাহা আবশ্যক তাহার কিছুরই অভাব থাকিল না। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও মনে সুখ-শান্তির উদয় হইল না। কি একটা অভাবের ছায়া প্রাণে সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিল। এইরূপে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল।

*　　*　　*

বেলগাঁ—১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উকিল বন্ধুটি বলিলেন, "ইনি একজন বিদ্বান্ বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" ফিরিয়া দেখিলাম—প্রশান্তমূর্তি, দুই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে, গোঁফ-দাড়ি কামান, অঙ্গে গেরুয়া আল্‌খাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটিজুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ি, সন্ন্যাসীর সে অপরূপ মূর্তি স্মরণ হইলে এখনও যেন তাঁহাকে চোখের সামনে দেখি। দেখিয়া আনন্দ

হইল—তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম। কিন্তু তখন উহার কারণ জানিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন আর হুঁকা নাই। আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।" তিনি বলিলেন, "তামাক চুরুট যখন যাহা পাই তখন তাহাই খাইয়া থাকি, আর আপনার হুঁকায় খাইতে কিছুই আপত্তি নাই।" তামাক সাজাইয়া দিলাম। তখন আমার বিশ্বাস, গেরুয়া-বেশধারী সন্ন্যাসীমাত্রেই জুয়াচোর! ভাবিলাম ইনিও কিছু প্রত্যাশা করিয়া আমার কাছে আসিয়াছেন। তাহা ছাড়া উকিল বন্ধু মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, ইনি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত মিল হওয়া কঠিন; তাই বোধ হয় আমার বাড়ীতে থাকিবার জন্য আসিয়াছেন। মনে এইরূপ নানা তোলপাড় করিয়া তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিসপত্র আমার বাসায় আনাইব কি-না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি উকিল বাবুর বাড়ীতে বেশ আছি। আর বাঙ্গালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে দুঃখ হইবে; কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন—অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।" সে রাত্রে বড় বেশী কথাবার্ত্তা হইল না; কিন্তু দুই-চারি কথা যাহা বলিলেন তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমাপেক্ষা হাজারগুণে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান; ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি ছোঁন না ও সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমাপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী। বোধ হইল, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, কারণ স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা নাই। আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম, "যদি চা

খাইবার আপত্তি না থাকে তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব।" তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন এবং উকিলটির সহিত তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম; মনে হইল—এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদা সন্তুষ্ট, প্রফুল্ল-মুখ পুরুষ ত কখন দেখি নাই। মনে করিতাম, যাহার পয়সা নাই তাহার মরণ ভাল; বাস্তবিক নিস্পৃহ সন্ন্যাসী জগতে অসম্ভব—কিন্তু সে বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া এতদিনে তাহাকে শিথিল করিল।

পরদিন ১৯শে অক্টোবর, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়া স্বামীজীর পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্বামীজীর দেখা নাই। আর অপেক্ষা না করিয়া আমি একটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী যেখানে ছিলেন তথায় গেলাম। গিয়া দেখি তথায় মহাসভা; স্বামীজী বসিয়া আছেন ও নিকটে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান্ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে। স্বামীজী কাহারও সহিত ইংরেজীতে, কাহারও সহিত সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্থানীতে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেহ কেহ হক্স্লের ফিলজফিকে প্রামাণিক মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামীজীর সহিত তর্ক করিতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে, কাহাকেও গম্ভীরভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিয়া অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি মনুষ্য না দেবতা? কাজেই তাঁহার সমুদয় কথা মনে রহিল না। যাহা মনে আছে তাহার কয়েকটি লিখিলাম।

কোন গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ উকিল প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজী, সন্ধ্যা আহ্নিক

হইল—তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম। কিন্তু তখন উহার কারণ জানিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন আর হুঁকা নাই। আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।" তিনি বলিলেন, "তামাক চুরুট যখন যাহা পাই তখন তাহাই খাইয়া থাকি, আর আপনার হুঁকায় খাইতে কিছুই আপত্তি নাই।" তামাক সাজাইয়া দিলাম। তখন আমার বিশ্বাস, গেরুয়া-বেশধারী সন্ন্যাসীমাত্রেই জুয়াচোর! ভাবিলাম ইনিও কিছু প্রত্যাশা করিয়া আমার কাছে আসিয়াছেন। তাহা ছাড়া উকিল বন্ধু মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, ইনি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত মিল হওয়া কঠিন; তাই বোধ হয় আমার বাড়ীতে থাকিবার জন্য আসিয়াছেন। মনে এইরূপ নানা তোলপাড় করিয়া তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিসপত্র আমার বাসায় আনাইব কি-না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি উকিল বাবুর বাড়ীতে বেশ আছি। আর বাঙ্গালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে দুঃখ হইবে; কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন—অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।" সে রাত্রে বড় বেশী কথাবার্ত্তা হইল না; কিন্তু দুই-চারি কথা যাহা বলিলেন তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমাপেক্ষা হাজারগুণে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান; ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি ছোঁন না ও সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমাপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী। বোধ হইল, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, কারণ স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা নাই। আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম, "যদি চা

খাইবার আপত্তি না থাকে তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব।" তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন এবং উকিলটির সহিত তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম; মনে হইল—এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদা সন্তুষ্ট, প্রফুল্ল-মুখ পুরুষ ত কখন দেখি নাই। মনে করিতাম, যাহার পয়সা নাই তাহার মরণ ভাল; বাস্তবিক নিস্পৃহ সন্ন্যাসী জগতে অসম্ভব—কিন্তু সে বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া এতদিনে তাহাকে শিথিল করিল।

পরদিন ১৯শে অক্টোবর, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়া স্বামীজীর পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্বামীজীর দেখা নাই। আর অপেক্ষা না করিয়া আমি একটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী যেখানে ছিলেন তথায় গেলাম। গিয়া দেখি তথায় মহাসভা; স্বামীজী বসিয়া আছেন ও নিকটে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান্ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে। স্বামীজী কাহারও সহিত ইংরেজীতে, কাহারও সহিত সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্থানীতে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেহ কেহ হক্সলের ফিলজফিকে প্রামাণিক মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামীজীর সহিত তর্ক করিতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে, কাহাকেও গম্ভীরভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিয়া অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি মনুষ্য না দেবতা? কাজেই তাঁহার সমুদয় কথা মনে রহিল না। যাহা মনে আছে তাহার কয়েকটি লিখিলাম।

কোন গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ উকিল প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজী, সন্ধ্যা আহ্নিক

প্রভৃতির মন্ত্রাদি সংস্কৃতভাষায় রচিত ; আমরা তাহা বুঝি না। আমাদের ঐসকল মন্ত্রোচ্চারণে কিছু ফল আছে কি ?"

স্বামীজী উত্তর করিলেন, "অবশ্যই উত্তম ফল আছে ; ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া ঐ কয়টি সংস্কৃত মন্ত্রাদি ত ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পার, তথাপি লও না। ইহা কাহার দোষ ? আর যদি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝিতে পার তথাপি যখন সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বস, তখন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছি মনে কর, না—কিছু পাপ করিতেছ মনে কর ? যদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছি মনে করিয়া বস, তাহা হইলে উত্তম ফল লাভ করিতে উহাই যে যথেষ্ট।"

অন্য একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বলিলেন, "ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন, ম্লেচ্ছভাষায় করা উচিত নহে ; অমুক পুরাণে এইরূপ লেখা আছে।"

স্বামীজী উত্তর করিলেন, "যে-কোন ভাষাতেই হোক্ ধর্ম্মচর্চ্চা করা যায়" এবং এই বাক্যের সমর্থনে শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণস্বরূপ দিয়া বলিলেন, "হাইকোর্টের নিষ্পত্তি নিম্ন আদালত দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে না।"

এইরূপে নয়টা বাজিয়া গেল। যাঁহাদের অফিস বা কোর্টে যাইতে হইবে তাঁহারা চলিয়া গেলেন, কেহ বা তখনও বসিয়া রহিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ায়, পূর্ব্বদিনের চা খাইতে যাবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, "বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুণ্ণ করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না।" পরে আমি তাঁহাকে আমার বাসায় আসিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় অবশেষে বলিলেন, "আমি যাঁহার অতিথি তাঁহার মত করিতে পারিলে, আমি তোমারই নিকট থাকিতে প্রস্তুত।" উকিলটিকে বিশেষ বুঝাইয়া স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া আমার বাসায় আসিলাম। সঙ্গে মাত্র একটি কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা একখানি পুস্তক। স্বামীজী তখন ফ্রান্স দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক

অধ্যয়ন করিতেন। পরে বাসায় আসিয়া দশটার সময় চা খাওয়া হইল; তাহার পরেই আবার এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলও চাহিয়া খাইলেন। আমার নিজের মনে যে সমস্ত কঠিন সমস্যা ছিল সে-সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সহসা ভরসা হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া, তিনি নিজেই আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দুই কথাতেই বুঝিয়া লইলেন।

ইতঃপূর্ব্বে 'টাইম্‌স্' সংবাদপত্রে একজন একটি সুন্দর কবিতায় ঈশ্বর কি, কোন্ ধর্ম্ম সত্য,—প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন, লিখিয়াছিলেন; সেই কবিতাটি আমার তখনকার ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত ঠিক মিল হওয়ায়, আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাই তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন, "লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।" আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। খ্রীষ্টান মিশনরীদের সহিত 'ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান্, এককালে দুই-ই হইতে পারেন না'—এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই; মনে করিলাম, এ সমস্যাপূরণ স্বামীজীও করিতে পারিবেন না। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তুমি ত Science (বিজ্ঞান) অনেক পড়িয়াছ, দেখিতেছি। প্রত্যেক জড়পদার্থে দুইটি opposite forces centripetal and centrifugal কি act করে না? যদি দুইটি opposite forces জড়বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ন্যায় opposite হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভবে না? All I can say is that you have a very poor idea of your God." আমি ত নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস—Truth is absolute. সমস্ত ধর্ম্ম কখন এককালে সত্য হইতে পারে না। তিনি সে-সব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, আমরা যে বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব সে-সকলই আপেক্ষিক সত্য বা Relative truths. Absolute truth-

এর ধারণা আমাদের সীমাবদ্ধ মন-বুদ্ধির অসম্ভব। অতএব সত্য Absolute হইলেও বিভিন্ন মন-বুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি নিত্য (Absolute) সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সে সকলগুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর। যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান হইতে photograph লইলে একই সূর্য্যের ছবি নানারূপ দেখায়, মনে হয়—প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্যের—তদ্রূপ। আপেক্ষিক সত্য (Relative truth)-সকল, নিত্য সত্যের (Absolute truth) সম্বন্ধে ঠিক ঐ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্ম্মই সেই জন্য নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য।

বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল বলায় স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "রাজা হইলে আর খাওয়া-পরার কষ্ট থাকে না, কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন; বিশ্বাস কি কখন জোর করিয়া হয়? অনুভব না হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব।" কোন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে 'সাধু' বলায় তিনি উত্তর করিলেন, "আমরা কি সাধু? এমন অনেক সাধু আছেন যাঁহাদের দর্শন বা স্পর্শমাত্রেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়।"

"সন্ন্যাসীরা এরূপ অলস হইয়া কেন কালক্ষেপ করেন? অপরের সাহায্যের উপর কেন নির্ভর করিয়া থাকেন?—সমাজের হিতকর কোন কাজকর্ম্ম কেন করেন না?"—প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি—তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ। তাহার যৎসামান্য অংশ কেবল নিজের জন্য খরচ করিতেছ; বাকি কতক অন্য কতকগুলি লোককে আপনার ভেবে তাহাদের জন্য খরচ করিতেছ। তাহারা তজ্জন্য না তোমার কৃত উপকার মানে, না যাহা ব্যয় কর তাহাতে

সন্তুষ্ট। বাকি যকের মত প্রাণপণে জমাইতেছ ; তুমি মরিয়া গেলে অন্য কেহ তাহা ভোগ করিবে, আর হয়ত—আরো টাকা রাখিয়া যাও নাই বলিয়া গালি দিবে। এই ত গেল তোমার হাল। আর আমি, ওসব কিছু করি না। ক্ষুধা পাইলে পেট চাপড়াইয়া, হাত মুখে তুলিয়া দেখাই ; যাহা পাই, তাহা খাই ; কিছুই কষ্ট করি না ; কিছুই সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর কে বুদ্ধিমান ?—তুমি কি আমি ?" আমি ত শুনিয়া অবাক্, ইহার পূর্ব্বে আমার সম্মুখে এরূপ স্পষ্ট-কথা বলিতে ত কাহারও সাহস দেখি নাই।

আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রামের পর, পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটির বাসায় যাওয়া হইল ও তথায় অনেক বাদানুবাদ ও কথোপকথন চলিল। রাত্রি নয়টার সময় স্বামীজীকে লইয়া পুনরায় আমার বাসায় ফিরিলাম। আসিতে আসিতে বলিলাম, "স্বামীজী, আপনার আজ তর্কবিতর্কে অনেক কষ্ট হইয়াছে।"

তিনি বলিলেন, "বাবা, তোমরা যেরূপ utilitarian, যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে এক মুঠা খাইতে দাও ? আমি এইরূপ গল্ গল্ করিয়া বকি, লোকের শুনিয়া আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেনো, যেসকল লোক সভায় তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহারা বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় ওরূপ করে না। আমিও বুঝিতে পারি কে কি ভাবে কি কথা বল্‌লে ও তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা স্বামীজী, সকল প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কিরূপে ?"

তিনি বলিলেন, "ঐসকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন ; কিন্তু আমাকে

কত লোকে কতবার ঐ প্রশ্নসকল জিজ্ঞাসা করেছে, আর তাহার কতবার উত্তর দিয়াছি।" রাত্রে আহার করিতে বসিয়া আবার কত কথা কহিলেন। পয়সা না ছুঁইয়া দেশভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটনা হইয়াছিল সে-সব বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল—আহা! ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত না জানি সহ্য করিয়াছেন! কিন্তু তিনি—সে-সব যেন কত মজার কথা, এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে সমুদয় বলিতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন স্থানে লঙ্কা খাইয়া এমন পেটজ্বালা যে, এক বাটি তেঁতুল গোলা খাইয়াও থামে না, কোথাও—এখানে সাধু সন্ন্যাসী জায়গা পায় না—এই বলিয়া অপরের তাড়না, বা গুপ্ত পুলিসের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি যাহা শুনিলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, সেই-সব ঘটনা তাঁহার পক্ষে যেন তামাসা মাত্র।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার বিছানা করিয়া দিয়া আমিও ঘুমাইতে গেলাম; কিন্তু সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। ভাবিতে লাগিলাম, এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বামীজীকে দেখিয়া ও তাঁহার দুই-চার কথা শুনিয়াই সমস্ত দূর হইল! আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, আমাদের কেন—আমাদের চাকর-বাকরেরও তাঁহার প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা হইল যে, তাহাদের সেবায় ও আগ্রহে স্বামীজীকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতে হইত।

২০শে অক্টোবর, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ। সকালে উঠিয়া স্বামীজীকে নমস্কার করিলাম। এখন সাহস বাড়িয়াছে, ভক্তিও হইয়াছে। স্বামীজীও অনেক বন, নদী, অরণ্যের বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই শহরে আজ তাঁহার চার দিন বাস হইল। পঞ্চম দিনে তিনি বলিলেন, "সন্ন্যাসীদের নগরে তিন দিনের বেশী ও গ্রামে এক দিনের বেশী থাকিতে

নাই। আমি শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।" কিন্তু আমি ওকথা কোন মতেই শুনিব না, উহা তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই। পরে অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, "এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে মায়া মমতা বাড়িয়া যায়। আমরা গৃহ ও আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়াছি, সেইরূপ মায়ায় মুগ্ধ হইবার যত উপায় আছে তাহা হইতে দূরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।"

আমি বলিলাম যে, তিনি কখনও মুগ্ধ হইবার নন। পরিশেষে আমার অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া আরও দুই-চারি দিন থাকিতে স্বীকার করিলেন। ইতোমধ্যে আমার মনে হইল স্বামীজী যদি সাধারণের জন্য বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার লেক্‌চার শুনি এবং অপর কত লোকেরও কল্যাণ হয়। অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু লেক্‌চার দিলে হয়ত নাম-যশের ইচ্ছা হইবে, এই বলিয়া তিনি কোনমতে উহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে সভায় প্রশ্নের উত্তর দান (conversational meeting) করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, এ কথা জানাইলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী Pickwick Papers হইতে দুই-তিন পাতা মুখস্থ বলিলেন। আমি উহা অনেকবার পড়িয়াছি, বুঝিলাম— পুস্তকের কোন্ স্থান হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া আমার বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হইল। ভাবিলাম, সন্ন্যাসী হইয়া সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মুখস্থ করিলেন? পূর্ব্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "দুইবার পড়িয়াছি। একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও আজ পাঁচ-ছয় মাস হইল আর একবার।"

অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কেমন করিয়া স্মরণ রহিল? আমাদের কেন থাকে না?"

স্বামীজী বলিলেন, "একান্ত মনে পড়া চাই; আর খাদ্যের সারভাগ হইতে প্রস্তুত রেতের অপচয় না করিয়া পুনরায় উহা assimilate করা চাই।"

আর একদিন স্বামীজী মধ্যাহ্নে একাকী বিছানায় শুইয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন। আমি অন্য ঘরে ছিলাম। হঠাৎ এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন যে, আমি এ হাসির বিশেষ কোন কারণ আছে ভাবিয়া তাঁহার ঘরের দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বিশেষ কিছুই হয় নাই। তিনি যেমন বই পড়িতেছিলেন, তেমনি পড়িতেছেন। প্রায় ১৫ মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলাম, তথাপি তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন না। বই ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁহার মন নাই। পরে আমাকে দেখিয়া ভিতরে আসিতে বলিলেন এবং আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি শুনিয়া বলিলেন, "যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা একমনে, একপ্রাণে, সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাজিপুরের পব্‌হারী বাবা ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটীটি মাজাও ঠিক তেমনি একমনে করিতেন। এমনি মাজিতেন যে, সোনার মত দেখাইত।"

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজী, চুরি করা পাপ কেন? সকল ধর্ম্মে চুরি করিতে নিষেধ করে কেন? আমার মনে হয়, ইহা আমাদের, উহা অপরের ইত্যাদি মনে করা কেবল কল্পনামাত্র। কই, আমায় না জানাইয়া আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ আমার কোন দ্রব্য ব্যবহার করিলে ত উহা চুরি করা হয় না। তাহার পর পশু পক্ষী আদি আমাদের কোন জিনিস নষ্ট করিলে তাহাকেও ত চুরি বলি না।"

স্বামীজী বলিলেন, "অবশ্য, সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ে মন্দ এবং পাপ

বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এমন কোন জিনিস বা কার্য্য নাই। আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেক জিনিস মন্দ এবং প্রত্যেক কার্য্যই পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে যাহাতে অপর কাহারও কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয় এবং যাহা করিলে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার দুর্ব্বলতা আসে, সে কর্ম্ম করিবে না; উহাই পাপ, আর তদ্বিপরীত কর্ম্মই পুণ্য। মনে কর, তোমার কোন জিনিস কেহ চুরি করিলে তোমার দুঃখ হয় কি-না? তোমার যেমন, সমস্ত জগতেরও তেমনি জানিবে। এই দুই দিনের জগতে সামান্য কিছুর জন্য যদি তুমি এক প্রাণীকে দুঃখ দিতে পার, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে তুমি কি মন্দ কর্ম্ম না করিতে পারিবে? আবার পাপ-পুণ্য না থাকিলে সমাজ চলে না। সমাজে থাকিতে হইলে তাহার নিয়মাদি পালন করা চাই। বনে গিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচ, ক্ষতি নাই—কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না; কিন্তু শহরে করিলে পুলিসের দ্বারা ধরাইয়া তোমায় কোন নির্জ্জন স্থানে বন্ধ করিয়া রাখাই উচিত।"

স্বামীজী অনেক সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাষ্টারের কাছে বসার মত ছিল না। খুব রঙ্গরস চলিতেছে; বালকের মত হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন; আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক্ হইয়া ভাবিত,—ইহার ভিতর এত শক্তি! এই ত দেখিতেছিলাম, আমাদের মতনই একজন! সকল সময়েই তাঁহার নিকট লোকে শিক্ষা লইতে আসিত। সকল সময়েই তাঁহার অবারিত দ্বার ছিল। তাহার ভিতর নানা লোকে নানা ভাবেও

আসিত,—কেহ বা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে, কেহ বা খোশগল্প শুনিতে, কেহ বা তাঁহার নিকট আসিলে অনেক ধনী বড়লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে বলিয়া, আবার কেহ বা সংসার-তাপে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার নিকট দুই দণ্ড জুড়াইবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিবে বলিয়া। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, যে যে-ভাবেই আসুক না কেন, তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টির হাত হইতে কাহারও এড়াইবার বা কিছু গোপন করিবার সাধ্য ছিল না। এক সময়ে কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র সন্তান ইউনিভারসিটীর পরীক্ষার হস্ত এড়াইবে বলিয়া স্বামীজীর নিকট ঘন ঘন আসিতে লাগিল এবং সাধু হইবে, এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। সে আবার আমার এক বন্ধুর পুত্র। আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ ছেলেটি আপনার কাছে কি মতলবে এত বেশী বেশী আসে? উহাকে কি সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দেবেন? উহার বাপ আমার একজন বন্ধু।"

স্বামীজী বলিলেন, "উহার পরীক্ষা কাছে, পরীক্ষা দিবার ভয়ে সাধু হইবার ইচ্ছা। আমি উহাকে বলিয়াছি, এম্. এ. পাশ করিয়া সাধু হইতে আসিও; বরং এম্. এ. পাশ করা সহজ কিন্তু সাধু হওয়া তদপেক্ষা কঠিন।"

স্বামীজী আমার বাসায় যতদিন ছিলেন, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার কথোপকথন শুনিতে যেন সভা বসিয়া যাইত, এতই অধিক লোক-সমাগম হইত। ঐ সময় এক দিন আমার বাসায় একটি চন্দনগাছের তলায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, জন্মেও তাহা ভুলিতে পারিব না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথা বলিতে হইবে। সেইজন্য উহা অন্য সময়ের জন্য রাখাই যুক্তিযুক্ত। এস্থলে নিজের

কথা আর একটু বলিব। কিছু পূর্ব্ব হইতে আমার স্ত্রীর ইচ্ছা হয়, গুরুর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করে। আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। তবে আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, "এমন লোককে গুরু করিও, যাঁহাকে আমিও ভক্তি করিতে পারি। গুরু বাড়ী ঢুকিলেই যদি আমার ভাবান্তর হয়, তাহা হইলে তোমার কিছুই আনন্দ বা উপকার হইবে না। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহা হইলে উভয়ে মন্ত্র লইব, নতুবা নহে।" সেও তাহাতে স্বীকার পায়। স্বামীজীর আগমনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তাহা হইলে তুমি শিষ্যা হইতে ইচ্ছা কর কি?"

সেও আগ্রহে বলিল, "উনি কি গুরু হইবেন? হইলে ত আমরা কৃতার্থ হই।"

স্বামীজীকে একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজী, আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?" স্বামীজী প্রার্থনা জানাইবার আদেশ করিলে আমাদের উভয়কে দীক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম।

তিনি বলিলেন, "গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল। গুরু হওয়া বড় কঠিন। শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হয়। দীক্ষার পূর্ব্বে গুরুর সহিত শিষ্যের অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক" প্রভৃতি নানা কথা কহিয়া আমায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। যখন দেখিলেন, আমি কোনপ্রকারে ছাড়িবার নহে, তখন অগত্যা স্বীকার করিলেন ও (২৫শে অক্টোবর, ১৮৯২ সালে) আমাদের দীক্ষাপ্রদান করিলেন। এখন আমার ভারি ইচ্ছা হইল, স্বামীজীর ফটো তুলিয়া লই। তিনি সহজে স্বীকৃত হইলেন না। পরে অনেক বাদানুবাদের পর আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ২৮শে তারিখে ফটো তোলাইতে সম্মত হইলেন ও ফটো লওয়া হইল।

ইতঃপূর্ব্বে তিনি একজনের আগ্রহসত্ত্বেও ফটো তুলিতে দেন নাই বলিয়া আমাকে দুই কপি ফটো তাহাকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। আমিও সে কথা সানন্দে স্বীকার করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী বলিলেন, "তোমার সহিত জঙ্গলে তাঁবু খাটাইয়া আমার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু চিকাগোয় ধর্ম্মসভা হইবে, যদি তাহাতে যাইবার সুবিধা হয় ত তথায় যাইব।" আমি চাঁদার লিষ্ট করিয়া টাকাসংগ্রহের প্রস্তাব করায় তিনি কি ভাবিয়া স্বীকার করিলেন না। এই সময় স্বামীজীর ব্রতই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ করিবেন না। আমি অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহার মারহাট্টি জুতার পরিবর্ত্তে এক জোড়া জুতা ও একগাছি বেতের ছড়ি দিয়াছিলাম। ইতঃপূর্ব্বে কোলাপুরের রাণী অনেক অনুরোধ করিয়াও স্বামীজীকে কিছুই গ্রহণ করাইতে না পারিয়া অবশেষে দুইখানি গেরুয়া বস্ত্র পাঠাইয়া দেন। স্বামীজীও তাহা গ্রহণ করিয়া যে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা সেইখানেই ত্যাগ করেন এবং বলেন, "সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই ভাল।"

ইতঃপূর্ব্বে আমি ভগবদ্গীতা অনেক বার পড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বুঝিতে না পারায় পরিশেষে উহাতে বুঝিবার বড় কিছু নাই মনে করিয়া, ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। স্বামীজী গীতা লইয়া আমাদিগকে এক দিন বুঝাইতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, উহা কি অদ্ভুত গ্রন্থ! গীতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে তাঁহার নিকটে যেমন শিখিয়াছিলাম, তেমনি আবার অন্যদিকে Jules Verne-এর Scientific Novels এবং Carlyle-এর Sartor Resartus পড়িতে তাঁহার নিকটে শিখি।

তখন স্বাস্থ্যের জন্য ঔষধাদি অনেক ব্যবহার করিতাম। সে কথা জানিতে পারিয়া একদিন তিনি বলিলেন, "যখন দেখিবে কোন রোগ এত

প্রবল হইয়াছে যে, শয্যাশায়ী করিয়াছে, আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই ঔষধ খাইবে, নতুবা নহে। Nervous debility প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টা কাল্পনিক। ঐ সকল রোগের হাত হইতে ডাক্তারেরা যত লোককে বাঁচান, তার চাইতে বেশী লোককে মারেন। আর ওরূপ সর্ব্বদা রোগ রোগ করিয়াই বা কি হইবে? যত দিন বাঁচ আনন্দে কাটাও। তবে যে আনন্দে একবার সন্তাপ আসিয়াছে, তাহা আর করিও না। তোমার আমার মত একটা মরিলে পৃথিবীও আপনার কেন্দ্র হইতে দূরে যাইবে না, বা জগতের কোন বিষয়ের কিছু ব্যাঘাত হইবে না।" এই সময়ে আবার অনেক কারণ বশতঃ উপরিস্থ কর্ম্মচারী সাহেবদের সহিত আমার বড় একটা বনিত না। তাঁহারা সামান্য কিছু বলিলে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিত এবং এমন ভাল চাকরি পাইয়াও একদিনের জন্যও সুখী হই নাই। তাঁহাকে এ সমস্ত কথা বলায় তিনি বলিলেন, "কিসের জন্য চাকরি করিতেছ? বেতনের জন্য ত? বেতন ত মাসে মাসে ঠিক পাইতেছ, তবে কেন মনে কষ্ট পাও? আর ইচ্ছা হইলে যখন চাকরি ছাড়িয়া দিতে পার, কেহ বাঁধিয়া রাখে নাই, তখন 'বিষম বন্ধনে পড়িয়াছি' ভাবিয়া দুঃখের সংসারে আরও দুঃখ বাড়াও কেন? আর এক কথা, বল দেখি, যাহার জন্য বেতন পাইতেছ, আফিসের সেই কাজগুলি করিয়া দেওয়া ছাড়া, তোমার উপরওয়ালা সাহেবদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য কখনও কিছু করিয়াছ কি? কখনও সেজন্য চেষ্টা কর নাই, অথচ তাহারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নহে বলিয়া তাহাদের উপর বিরক্ত! ইহা কি বুদ্ধিমানের কাজ? জানিও, আমরা অন্যের উপর হৃদয়ের যে ভাব রাখি, তাহাই কাজে প্রকাশ পায়; আর প্রকাশ না করিলেও তাহাদের ভিতরে আমাদের উপর, ঠিক সেই ভাবের উদয় হয়। আমাদের ভিতরকার ছবিই আমরা জগতে প্রকাশ রহিয়াছে.

দেখি। ‘আপ্ ভাল তো জগৎ ভাল’ একথা যে কতদূর সত্য কেহই জানে না। আজ হইতে মন্দটি দেখা একেবারে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা কর। দেখিবে, যে পরিমাণে তুমি উহা করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তাহাদের ভিতরের ভাব এবং কার্য্যও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।” বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে আমার ঔষধ খাইবার বাতিক দূর হইল এবং অপরের উপর দোষদৃষ্টি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করায় ক্রমে জীবনের একটা নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল।

স্বামীজীর নিকট একবার, ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি—এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হওয়ায় তিনি বলিলেন, “যাহা অভীষ্ট কার্য্যের সাধনভূত তাহাই ভাল; আর যাহা তাহার প্রতিরোধক তাহাই মন্দ। ভাল-মন্দের বিচার, আমরা জায়গা উঁচু-নিচু-বিচারের ন্যায় করিয়া থাকি। যত উপরে উঠিবে তত দুই, এক হয়ে যাবে। চন্দ্রেতে পাহাড় ও সমতল আছে—বলে; কিন্তু আমরা সব এক দেখি—সেইরূপ।” স্বামীজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল, যে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভিতর হইতে এমন যোগাইত যে, মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইত।

আর একদিনের কথা—কলিকাতায় একটি লোক অনাহারে মারা গিয়াছে, খবরের কাগজে এই কথা পড়িয়া স্বামীজী এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, তাহা বলিবার নহে। বার বার বলিতে লাগিলেন, “এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়!” কেন—জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, “দেখিতেছ না, অন্যান্য দেশে কত poor-house, work-house, charity fund প্রভৃতি সত্ত্বেও শত শত লোক প্রতিবৎসর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিন্তু এক মুষ্টিভিক্ষার পদ্ধতি থাকায় অনাহারে লোক মরিতে কখন শোনা যায় নাই। আমি এই

প্রথম কাগজে এ কথা পড়িলাম যে, দুর্ভিক্ষে ভিন্ন অন্য সময়ে কলিকাতায় অনাহারে লোক মরে।"

ইংরেজী শিক্ষার কৃপায় আমি দুই-চারি পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করিতাম। মনে হইত, ঐরূপে যৎসামান্য যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাতে তাহাদের কোন উপকার তো হয়ই না; বরং বিনা পরিশ্রমে পয়সা পাইয়া, তাহা মদ গাঁজায় খরচ করিয়া তাহারা আরো অধঃপাতে যায়। লাভের মধ্যে দাতার কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায়। সে জন্য আমার মনে হইত, লোককে কিছু কিছু দেওয়া অপেক্ষা একজনকে বেশী দেওয়া ভাল। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "ভিখারী আসিলে যদি শক্তি থাকে তো যাহা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তো দুই-একটি পয়সা; তজ্জন্য সে কিসে খরচ করিবে, সদ্ব্যয় হইবে কি অপব্যয় হইবে, এসব লইয়া এত মাথা ঘামাইবার দরকার কি? আর সত্যই যদি সেই পয়সা গাঁজা খাইয়া উড়ায়, তাহা হইলেও তাহাকে দেওয়ায় সমাজের লাভ বৈ লোকসান নাই। কেন না, তোমার মত লোকেরা তাহাকে দয়া করিয়া কিছু কিছু না দিলে, সে উহা তোমাদের নিকট হইতে চুরি করিয়া লইবে। তাহা অপেক্ষা দুই পয়সা ভিক্ষা করিয়া গাঁজা টানিয়া, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা কি তোমাদেরই ভাল নহে? অতএব ঐপ্রকার দানেও সমাজের উপকার বই অপকার নাই।"

প্রথম হইতেই স্বামীজীকে বাল্যবিবাহের উপর ভারি চটা দেখিয়াছি। সর্ব্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্যোগী ও সন্তুষ্টচিত্ত হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুরাগও কোন মানুষের দেখি নাই। পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে ফিরিবার পর যাহারা স্বামীজীর প্রথম দর্শন পাইয়াছেন

তাঁহারা জানেন না, তথায় যাইবার পূর্ব্বে তিনি সন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন করিয়া, কাঞ্চন মাত্র স্পর্শ না করিয়া কত কাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মত শক্তিমান পুরুষের এত বাঁধাবাঁধি নিয়মাদির আবশ্যক নাই—কোন লোক একবার এইকথা বলায় তিনি বলেন, "দেখ, মন বেটা বড় পাগল, ঘোর মাতাল, চুপ করে কখনই থাকে না; একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাবে। সেই জন্য সকলেরই বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্য নিয়মে চলিতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর তাঁহাদের খুব দখল আছে। তবে ইচ্ছা করিয়া কখন একটু আল্‌গা দেন মাত্র। কিন্তু কাহার কতটা দখল হইয়াছে, তাহা একবার ধ্যান করিতে বসিলেই টের পাওয়া যায়। এক বিষয়ের উপর চিন্তা করিব মনে করিয়া বসিলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না। সকলেই মনে করেন, তাঁহারা স্ত্রৈণ নন, তবে আদর করিয়া স্ত্রীকে আধিপত্য করিতে দেন মাত্র। মনকে বশে রাখিয়াছি মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করিয়া কখন নিশ্চিন্ত থাকিও না।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিলাম, "স্বামীজী, দেখিতেছি ধর্ম্ম ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক লেখাপড়া জানা আবশ্যক।"

তিনি বলিলেন, "নিজে ধর্ম্ম বুঝিবার জন্য লেখাপড়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব 'রামকেষ্ট' বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্ম্মের সারতত্ত্ব তাঁহা অপেক্ষা কে বুঝিয়াছিল?"

আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু-সন্ন্যাসীর স্থূলকায় ও সদাসন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব। একদিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা

বলায় তিনিও বিদ্রূপচ্ছলে উত্তর করিলেন, "ইহাই আমার Famine Insurance Fund; যদি পাঁচ-সাত দিন খাইতে না পাই, তবু আমার চর্ব্বি আমাকে জীবিত রাখিবে। তোমরা একদিন না খাইলেই সব অন্ধকার দেখিবে। আর যে ধর্ম্মে মানুষকে সুখী করে না, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে, dyspepsia-প্রসূত রোগবিশেষ বলিয়া জানিও।" স্বামীজী সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন একটি গান আরম্ভও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস'; তারপর শুনিবার আমার অবসরই বা কোথায়? তাঁহার কথা ও গল্পই আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন। আবার ধর্ম্মবিষয়ক মীমাংসাসকল পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের একই লক্ষ্য, একই দিকে গতি, দেখাইতে তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় ক্ষমতা আর কাহারও দেখা যায় নাই।

লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেন, "পর্য্যটনকালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়; তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষনিবারণের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকে। আমিও সেই জন্য এত লঙ্কা খাই।"

রাজোয়ারা ও ক্ষেত্‌ড়ির রাজা, কোলাপুরের ছত্রপতি, ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা-রাজড়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন; তাঁহাদেরও তিনি

অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অসামান্য ত্যাগী হইয়া, রাজা-রাজড়ার সহিত অত মেশামিশি তিনি কেন করেন, একথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইত না। কোন কোন নির্বোধ লোক এজন্য তাঁহাকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না।

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিলেন, 'হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়া ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে লওয়াইয়া যে ফল হইবে, একজন শ্রীমান্ রাজাকে সেই দিকে লওয়াইতে পারিলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হইবে, ভাব দেখি। গরীব প্রজার ইচ্ছা হইলেও সৎকার্য্য করিবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে তাহার ভিতর একবার জাগাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধীনস্থ সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং জগতের কত বেশী কল্যাণ হইবে।"

বাগ্‌বিতণ্ডায় ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম অনুভব-প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেন, "Test of pudding lies in eating, অনুভব কর; তাহা না হইলে কিছুই বুঝিবে না।" তিনি কপট সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বলিতেন, "ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল; নতুবা নবানুরাগটুকু কমিবার পর প্রায় গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু ঘরে থাকিয়া সেটি হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন; আপনি সর্ব্বভূতকে সমান চোখে দেখা, রাগ দ্বেষ ত্যাগ করা প্রভৃতি যে-সকল কাজ ধর্ম্মলাভের প্রধান সহায় বলেন, তাহা যদি আমি আজ হইতে অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তাহা হইলে কাল হইতে আমার চাকর ও

অধীনস্থ কর্মচারিগণ এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শান্তিতে থাকিতে দিবে না।"

উত্তরে তিনি পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্প ও সন্ন্যাসীর গল্পটি বলিয়া বলিলেন, "কখন ফোঁস ছেড়ো না, আর কর্ত্তব্য পালন করিতেছ মনে করিয়া সকল কর্ম্ম করিও। কেহ দোষ করে, দণ্ড দিবে, কিন্তু দণ্ড দিতে গিয়া কখন রাগ করিও না।" পরে পূর্ব্বের প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া বলিলেন, "এক সময়ে আমি এক তীর্থস্থানের পুলিস ইন্‌স্পেক্‌টরের অতিথি হইয়াছিলাম; লোকটির বেশ ধর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁহার বেতন ১২৫৲ টাকা, কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার বাসার খরচ মাসে দুই-তিন শত টাকা হইবে। যখন বেশী জানাশুনা হইল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার ত আয় অপেক্ষা খরচ বেশী দেখিতেছি—চলে কিরূপে?' তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আপনারাই চালান। এই তীর্থস্থলে যে-সকল সাধু-সন্ন্যাসী আসেন, তাঁহাদের ভিতরে সকলেই কিছু আপনার মত নন। সন্দেহ হইলে তাঁহাদের নিকট কি আছে না আছে, তল্লাস করিয়া থাকি। অনেকের নিকট প্রচুর টাকাকড়ি বাহির হয়। যাহাদিগকে চোর সন্দেহ করি, তাহারা টাকা কড়ি ফেলিয়া পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুষঘাস কিছু লই না।"

স্বামীজীর সহিত একদিন অনন্ত (Infinity) পদার্থ সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা হয়। সেই কথাটি বড়ই সুন্দর ও সত্য; তিনি বলিলেন, "There can be no two infinities." আমি সময় অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলেন, "আকাশ অনন্তটা বুঝিলাম কিন্তু সময় অনন্তটা বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ অনন্ত, এ কথা বুঝি, কিন্তু দুইটা জিনিস অনন্ত হইলে কোন্‌টা

কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখবে, সময়ও যাহা আকাশও তাহাই; আরও অগ্রসর হইয়া বুঝিবে, সকল পদার্থই অনন্ত, ও সেইসকল অনন্ত পদার্থ একটা বই দুইটা দশটা নয়।"

এইরূপে স্বামীজীর পদার্পণে ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত আমার বাসায় আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল। ২৭শে তারিখে বলিলেন, "আর থাকিব না; রামেশ্বর যাইব মনে করিয়া অনেক দিন হইল এই দিকে চলিতেছি। যদি এই ভাবে অগ্রসর হই, তাহা হইলে এ জনমে আর রামেশ্বর পৌঁছান হইবে না।" আমি অনেক অনুরোধ করিয়াও আর রাখিতে পারিলাম না। ২৭শে অক্টোবর মেল ট্রেনে, তিনি মরমাগোয়া যাত্রা করিবেন, স্থির হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম ও বলিলাম, "স্বামীজী, জীবনে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই, আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।"

* * *

স্বামীজীর সহিত আমার তিনবার মাত্র দেখা হয়। প্রথম আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে। সেবারকার দেখার কথা অনেকটা আপনাদের বলিয়াছি। বেলগাঁ বা বেলগ্রামে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। দ্বিতীয়, যখন তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত এবং আমেরিকা যাত্রা করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে। তৃতীয় এবং শেষবার দেখা হয়, তাঁহার দেহত্যাগের ছয়-সাত মাস পূর্ব্বে। এই কয়বারে তাঁহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। অনেক কথা আমার নিজের সম্বন্ধে বলিয়া বলিবার নহে; আবার অনেক কথা ভুলিয়াও গিয়াছি। যাহা মনে

আছে, তাহার ভিতর সাধারণ-পাঠকের উপযোগী বিষয়গুলি জানাইতে চেষ্টা করিব।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি হিন্দুদিগের জাতি-বিচার সম্বন্ধে ও কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যবহারের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া যে বক্তৃতাগুলি মাদ্রাজে করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, স্বামীজীর ভাষাটা একটু বেশী কড়া হইয়াছে। তাঁহার নিকট সে কথা প্রকাশও করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্ত সত্য। আর যাঁহাদের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহাদের কার্য্যের তুলনায় উহা বিন্দুমাত্রও অধিক কড়া নহে। সত্য কথার সঙ্কোচ বা গোপন করার তো কোন কারণ দেখি না; তবে ঐরূপ কার্য্যের ঐরূপ সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া মনে করিও না যে, তাঁহাদের উপর আমার রাগ ছিল বা আছে অথবা কেহ কেহ যেমন ভাবিয়া থাকেন, কর্ত্তব্যবোধে যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য এখন আমি দুঃখিত। ও কথার একটাও সত্য নহে। আমি রাগিয়াও ঐ কাজ করি নাই এবং করিয়াছি বলিয়াও দুঃখিত নহি। এখনও যদি ঐরূপ কোন অপ্রিয় কার্য্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এখনও ঐরূপ নিঃসঙ্কোচে উহা নিশ্চয় করি।"

ভণ্ড সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে তাঁহার মতামত পূর্ব্ববারে কিছু বলিয়াছি। আর একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উঠায় বলিলেন, "অবশ্য অনেক বদমায়েস লোক ওয়ারেণ্টের ভয়ে কিংবা উৎকট দুষ্কর্ম্ম করিয়া লুকাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশে বেড়ায় সত্য; কিন্তু তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কর, কেহ সন্ন্যাসী হইলেই তাহার ঈশ্বরের মত ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই। সে পেট ভরিয়া ভাল খাইলে দোষ, বিছানায় শুইলে

দোষ, এমন কি, জুতা বা ছাতি পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহার করার জো নাই। কেন, তারাও তো মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস না হইলে তাহার আর গেরুয়া বস্ত্র পরিবার অধিকার নাই—ইহা ভুল। এক সময়ে আমার একটি সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হয়। তাঁহার ভাল পোশাকের উপর ভারি ঝোঁক। তোমরা তাঁহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করিবে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী।"

স্বামীজী বলিতেন, "দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে মানসিক ভাব ও অনুভবের অনেক তারতম্য হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রত্যেক মানুষেরই আবার একটা-না-একটা বিষয়ে বেশী ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের সকলেই আপনাকে বেশী বুদ্ধিমান মনে করে। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমিই কেবল বুঝি, অন্যে বুঝে না, ইহাতেই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। সকলেই চায়, প্রত্যেক বিষয়টা অপর সকলে তাহারই মত দেখুক ও বুঝুক। সে যেটা সত্য বুঝিয়াছে বা যাহা জানিয়াছে, তাহা ছাড়া আর কোন সত্য থাকিতে পারে না। সাংসারিক বিষয়েই হউক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই হউক, ওরূপ ভাব কোনমতে মনে আসিতে দেওয়া উচিত নয়।

"জগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন খাটে না। দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে নীতি এবং সৌন্দর্য্যবোধও বিভিন্ন দেখা যায়। তিব্বত দেশে এক স্ত্রীলোকের বহু পতি থাকা প্রথা প্রচলিত আছে। হিমালয়ভ্রমণ-কালে আমার ঐরূপ একটি তিব্বতীয় পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পরিবারে ছয়জন পুরুষ এবং ঐ ছয়জনের একমাত্র স্ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয়ের গাঢ়তা জন্মিলে আমি একদিন তাহাদের ঐ কুপ্রথা সম্বন্ধে বলায় তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, 'তুমি সাধু সন্ন্যাসী হইয়া লোককে

স্বার্থপরতা শিখাইতে চাহিতেছ? এটি আমারই উপভোগ্য, অন্যের নয়—এরূপ ভাব কি অন্যায় নহে?' আমি ত শুনিয়া অবাক।

"নাসিকা এবং পায়ের খর্ব্বতা লইয়াই চীনের সৌন্দর্য্য-বিচার, একথা সকলেরই জানা আছে। আহারাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইংরেজ আমাদের মত সুবাসিত চাউলের অন্ন ভালবাসে না। এক সময়ে কোন স্থানের জজসাহেবের অন্যত্র বদলি হওয়ায় তথাকার কতকগুলি উকিল মোক্তার তাঁহার সম্মানার্থ উত্তম সিধা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েক সের সুবাসিত চাউল ছিল। জজসাহেব সুবাসিত চাউলের ভাত খাইয়া উহা পচা চাউল মনে করেন এবং উকিলদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলেন, 'You ought not to have given me rotten rice.' (তোমাদের পচা চাউলগুলো আমাকে উপঢৌকন দেওয়া ভাল হয় নাই।)

"কোন এক সময়ে ট্রেনে যাইতেছিলাম; সেই কামরায় চার-পাঁচটি সাহেব ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তামাকের বিষয়ে আমি বলিলাম, 'সুবাসিত গুড়ুক তামাক জলপূর্ণ হুঁকায় ব্যবহার করাই তামাকু-সেবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ।' আমার নিকট খুব ভাল তামাক ছিল, তাঁহাদিগকে উহা দেখিতেও দিলাম। তাঁহারা আঘ্রাণ লইয়াই বলিলেন, 'এ ত অতি দুর্গন্ধ! ইহাকে তুমি সুগন্ধ বল?' এইরূপে গন্ধ, আস্বাদ, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমাজ-দেশ-কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত।"

স্বামীজীর পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। আমার মনে হইল, পূর্ব্বে শিকার করা আমার কত প্রিয় ছিল। কোন পশু পক্ষী দেখিলে কতক্ষণে উহাকে মারিব, এই জন্য প্রাণ ছট্ ফট্ করিত। মারিতে না পারিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। এখন ওরূপ প্রাণিবধ

একেবারেই ভাল লাগে না। সুতরাং কোন জিনিসটা ভাল লাগা বা মন্দ লাগা কেবল অভ্যাসের কাজ।

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জিদ দেখা যায়। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজী ঐ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেন। এক সময়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিবার জন্ম অন্য এক রাজা সদলবলে উপস্থিত হইলেন। কাজেই শত্রুর হাত হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায় স্থির করিবার জন্ম সেই রাজ্যে এক মহা সভা আহূত হইল। সভায় ইঞ্জিনিয়ার, সূত্রধর, চর্ম্মকার, কর্ম্মকার, উকিল, পুরোহিত প্রভৃতি সভাসদ্‌গণ উপস্থিত হইলেন। ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন, 'শহরের চারিদিকে বেড়া দিয়া এক বৃহৎ খাল খনন কর।' সূত্রধর বলিল, কাঠের দেওয়াল দেওয়া যাক্।' চামার বলিল, 'চামড়ার মত মজবুত কিছুই নাই; চামড়ার বেড়া দাও।' কামার বলিল, 'ওসব কাজের কথা নয়; লোহার দেওয়ালই ভাল; ভেদ করিয়া গুলিগোলা আসতে পারবে না।' উকিল বলিলেন, 'কিছুই করিবার দরকার নাই; আমাদের রাজ্য লইবার শত্রুদের কোন অধিকার নাই,—এই কথাটি, তাহাদের তর্কযুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাউক।' পুরোহিত বলিলেন, 'তোমরা সকলেই বাতুলের মত প্রলাপ বকিতেছ। হোম যাগ কর, স্বস্ত্যয়ন কর, তুলসী দাও, শত্রুরা কিছুই করিতে পারিবে না।' এইরূপে রাজ্য বাঁচাইবার কোন উপায় স্থির না করিয়া তাহারা নিজ নিজ মত লইয়া মহা হুলস্থুল তর্ক আরম্ভ করিল। এই রকম করাই মানুষের স্বভাব!

গল্পটি শুনিয়া আমারও মানুষের মনের একঘেয়ে ঝোঁক সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়িল। স্বামীজীকে বলিলাম, স্বামীজী, আমি ছেলেবেলায় পাগলের সহিত আলাপ করিতে বড় ভাল বাসিতাম। একদিন একটি

পাগল দেখিলাম, বেশ বুদ্ধিমান ; ইংরেজীও একটু-আধটু জানে ; তার চাই কেবল জল খাওয়া ! সঙ্গে একটি ভাঙ্গা ঘটী। যেখানে জল পায়, খাল হউক, হোউজ হউক, নূতন একটা জলের জায়গা দেখিলেই সেখানকার জল পান করিত। আমি তাহাকে এত জল খাবার কারণ জিজ্ঞাসায় সে বলিল, 'Nothing like water, sir !' (জলের মত কোন জিনিসই নাই, মোশাই !) তাহাকে আমি একটি ভাল ঘটী দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, সে উহা কোনমতে লইল না। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, 'এটি ভাঙ্গা ঘটী বলিয়াই এতদিন আছে। ভাল হইলে অন্তে চুরি করিয়া লইত।' "

স্বামীজী গল্প শুনিয়া বলিলেন, "সে ত বেশ মজার পাগল ! ওদের monomaniac বলে। আমাদের সকলেরই ঐ রকম এক একটা ঝোঁক আছে। আমাদের উহা চাপিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে। পাগলের তাহা নাই। পাগলের সহিত আমাদের এইটুকু মাত্র প্রভেদ। রোগে, শোকে, অহঙ্কারে, কামে, ক্রোধে, হিংসায় বা অন্য কোন অত্যাচার বা অনাচারে মানুষ দুর্ব্বল হইয়া ঐ সংযমটুকু হারালেই মুস্কিল ! মনের আবেগ আর চাপিতে পারে না। আমরা তখন বলি, ও ব্যাটা খেপেছে। এই আর কি !"

স্বামীজীর স্বদেশানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল ; এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের আপনাপন দেশের প্রতি অনুরাগ নিত্য কর্ত্তব্য হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের উপর সমদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সকল দেশের কল্যাণচিন্তা হৃদয়ে রাখা ভাল। ঐ কথার উত্তরে স্বামীজী যে জলন্ত কথাগুলি বলেন, তাহা কখনও জন্মেও ভুলিতে

পারিব না। তিনি বলিলেন, "যে আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে?" আমাদের প্রচলিত ধর্ম্মে, আচার-ব্যবহারে, সামাজিক প্রথায় যে অনেক দোষ আছে, স্বামীজী এ কথা স্বীকার করিতেন। বলিতেন, "সে-সকল সংশোধন করিবার চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সে-সকল ঘোষণা করিবার আবশ্যক কি? ঘরের গলদ বাহিরে যে দেখায়, তাহার মত গর্দ্দভ আর কে আছে? Dirty linen must not be exposed in the street." (ময়লা কাপড়-চোপড় রাস্তার ধারে, লোকের চোখের সামনে রাখাটা উচিত নয়।)

খ্রীষ্টান মিশনরীগণের সম্বন্ধে একদিন কথাবার্ত্তা হয়। তাঁহারা আমাদের দেশে কত উপকার করেছেন ও কর্‌ছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথা বলি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু অপকারও বড় কম করেন নাই। দেশের লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গোল্লায় দেবার বিলক্ষণ যোগাড় করেছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও নাশ হয়। এ কথা কেউ কি বোঝে? আমাদের দেবদেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্ম্মের কুৎসা না করিয়া কিন্তু তাঁহাদের নিজের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান যায় না? আর এক কথা, যিনি যে ধর্ম্মমত প্রচার করিতে চান, তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কাজ করা চাই। অধিকাংশ মিশনরী মুখে এক, কাজে আর। আমি কপটতার উপর ভারি চটা।"

একদিন ধর্ম্ম ও যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম যতদূর মনে আছে, এইখানে লিখিলাম,—

"সকল প্রাণীই সতত সুখী হইবার চেষ্টায় বিব্রত। কিন্তু খুব কম লোকই সুখী। কাজ কর্ম্মও সকলে অনবরত করিতেছে; কিন্তু তাহার

অভিলষিত ফল পাওয়া প্রায় দেখা যায় না। এরূপ বিপরীত ফল উপস্থিত হইবার কারণ কি, তাহাও সকলে বুঝিবার চেষ্টা করে না। সেই জন্যই মানুষ দুঃখ পায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হউক না কেন, কেহ যদি ঐ বিশ্বাস-বলে আপনাকে যথার্থ সুখী বলিয়া অনুভব করে, তাহা হইলে তাহার ঐ মত পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা কাহারও উচিত নহে; এবং করিলেও তাহাতে সুফল ফলে না। তবে মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, যখন দেখিবে কাহারও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শুনিবারই কেবলমাত্র আগ্রহ আছে, উহার কোন কিছু অনুষ্ঠানের চেষ্টা নাই, তখনই জানিবে যে তাহার কোন একটা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই।

"ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুখী করা। কিন্তু পরজন্মে সুখী হইব বলিয়া ইহজন্মে দুঃখভোগ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এই জন্মে, এই মুহূর্ত্ত হইতেই সুখী হইতে হইবে। যে ধর্ম্ম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইবে, তাহাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবী দুঃখও অনিবার্য্য। শিশু, অজ্ঞান ও পশু-প্রকৃতির লোকেরাই ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখমিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে করিয়া থাকে। যদি ঐ সুখকেও কেহ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া চিরকাল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও সুখী থাকিতে পারে, তাহাও মন্দ নহে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এরূপ লোক দেখা যায় নাই। সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে, যাহারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই সুখ মনে করে, তাহারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান, বিলাসী লোকদের অধিক সুখী মনে করিয়া দ্বেষ করিয়া থাকে এবং তাহাদের বহুব্যয়সাধ্য উচ্চশ্রেণীর ইন্দ্রিয়ভোগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া অসুখী হইয়া থাকে। সম্রাট্ আলেকজেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, পৃথিবীতে আর জয় করিবার দেশ নাই

ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য বুদ্ধিমান মনীষীরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া ভোগ বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্ম্মে যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হইতে পারে।

"বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেই জন্য তাহাদের উপযোগী ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক; নতুবা কিছুতেই উহা তাহাদের সন্তোষপ্রদ হইবে না, কিছুতেই তাহারা উহার অনুষ্ঠান করিয়া যথার্থ সুখী হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্ম্মমত, তাহাদের নিজেকেই ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেখিয়া ঠেকিয়া, বাছিয়া লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, গুরূপদেশ, সাধুদর্শন, সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি ঐ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করে মাত্র।

"কর্ম্ম সম্বন্ধেও জানা আবশ্যক যে, কোন-না-কোন প্রকার কর্ম্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না এবং কেবল ভাল বা কেবল মন্দ, জগতে এরূপ কোন কর্ম্মই নাই। ভালটা করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু মন্দ করিতেই হইবে। আর সেজন্য কর্ম্ম দ্বারা যেমন সুখ আসিবে, কিছু-না-কিছু দুঃখ এবং অভাববোধও সেই সঙ্গে আসিবেই আসিবে, উহা অবশ্যম্ভাবী। সে দুঃখটুকু যদি না লইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিষয়-ভোগ-জনিত আপাত সুখলাভের আশাটাও ছাড়িতে হইবে। অর্থাৎ স্বার্থ-সুখ অন্বেষণ না করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সকল কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। উহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। গীতাতে ভগবান্ অর্জ্জুনকে উহারই উপদেশ করিবার জন্য বলিতেছেন, 'কাজ কর, কিন্তু ফলটা আমাকে দাও; অর্থাৎ আমার জন্যই কাজ কর।'"

কোন বিষয়ের ইতিহাস যে কত দূর ঠিক ঠিক লেখা হয়, সে বিষয়ে বর্ত্তমান লেখকের বড়ই সন্দেহ। তাহার কারণ অনেক। গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কোন শহরে পদার্পণ হইতে সেই শহর ত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা যতদূর সম্ভব স্বচক্ষে দেখায় এবং পরে তাহারই বিবরণ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসকলে পাঠ করায়, আমাদের মত চাকুরে লোকের অনেক সুবিধা। সচরাচর আমাদের দৃষ্ট ঘটনাবলির সহিত ঐসকল বিবরণের এত বিভিন্নতা দেখা যায় যে, অবাক হইতে হয়। চারিদিন পূর্ব্বে যেসকল ঘটনা হইয়াছে, তাহাই যথাযথ লিপিবদ্ধ করা যদি এত কঠিন হয়, তাহা হইলে চারি শত, চারি সহস্র বা চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে ঘটনা হইয়াছে, তাহার ইতিহাস কতদূর যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতেই পারা যায়।

আর এক কথা, খ্রীষ্টান মিশনরীদের মধ্যে অনেকে বলেন,—তাঁহাদের বাইবেলের প্রত্যেক ঘটনাটি যে সালে, যে তারিখে, যে ঘণ্টায় এবং যে মিনিটে ঘটিয়াছিল, তাহা একেবারে ঘড়ি ধরিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু একদিকে 'Conflict Between Religion and Science' প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তকে বাইবেলের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদেরই দেশের এখনকার পণ্ডিতদের মতামত পাঠ করিয়া বাইবেলের ঐতিহাসিকত্ব যেমন বেশ বুঝা যায়, সেইরূপ অন্যদিকে মিশনরীদলের দ্বারা অনুবাদিত হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র-সকলের অপূর্ব্ব বিবরণ পাঠ করিয়া তাঁহাদের লিখিত ইতিহাসও যে কতদূর ঠিক হইবে তাহাও বুঝিতে বাকি থাকে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মানবজাতির সত্যানুরাগ এবং ইতিহাসে লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর হরিভক্তি প্রায় একেবারে উড়িয়া যায়।

গীতা, বাইবেল, কোরান, পুরাণ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থনিবদ্ধ

ঘটনাবলীর যথাযথ ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সেইজন্ত আমার আদৌ বিশ্বাস হইত না। স্বামীজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করি যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনতিপূর্বে অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-উপদেশ, যাহা ভগবদ্-গীতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা কি-না। উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বড় সুন্দর। তিনি বলিলেন, "গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন কালে ইতিহাস লেখার বা পুস্তকাদি ছাপার এখনকার মত এত ধুমধাম ছিল না; সেজন্ত তোমাদের মত লোকের কাছে ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু গীতোক্ত ঘটনা যথাযথ ঘটিয়াছিল কি-না, তজ্জন্ত তোমাদের মাথা ঘামাইবার কারণও দেখিতেছি না। কেন না যদি কেহ, শ্রীভগবান্ সারথি হইয়া অর্জ্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন, ইহা অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগে তোমাদের বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই কি তোমরা গীতাতে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা বিশ্বাস করিবে? সাক্ষাৎ ভগবান্ যখন তোমাদের নিকট মূর্তিমান হইয়া আসিলেও তোমরা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ছুট ও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে বল, তখন গীতা ঐতিহাসিক কি-না, এ বৃথা সমস্যা লইয়া কেন ঘুরিয়া বেড়াও? পার যদি তো গীতার উপদেশগুলি যতটা পার, জীবনে পরিণত করিয়া কৃতার্থ হও। পরমহংসদেব বলিতেন, 'আম খা, গাছের পাতা গুণে কি হবে?' আমার বোধ হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা is a matter of personal equation—অর্থাৎ মানুষ কোন এক অবস্থা-বিশেষে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধার-কামনায় পথ খুঁজিতে থাকে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কোন ঘটনার সহিত তাহার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিতে পাইলে, ঐ ঘটনা ঐতিহাসিক বলিয়া নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

আর ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ঐ অবস্থার উপযোগী উপায়ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে।"

স্বামীজী একদিন শারীরিক এবং মানসিক শক্তি অভীষ্ট কার্য্যের নিমিত্ত সংরক্ষণ করা যে প্রত্যেকের কতদূর কর্ত্তব্য, তাহা অতি সুন্দর ভাবে আমাদের বুঝাইয়াছিলেন,—"অনধিকার চর্চ্চায় বা বৃথা কাজে যে শক্তিক্ষয় করে, অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধির জন্য পর্য্যাপ্ত শক্তি সে আর কোথায় পাইবে? The sum-total of the energy which can be exhibited by an ego is a constant quantity—অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে নানাভাবে প্রকাশ করিবার যে শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা সসীম; সুতরাং সেই শক্তির অধিকাংশ একভাবে প্রকাশিত হইলে ততটা আর অন্যভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। ধর্ম্মের গভীর সত্য-সকল জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অনেক শক্তির প্রয়োজন; সেই জন্যই ধর্ম্মপথের পথিকদিগের প্রতি বিষয়ভোগ ইত্যাদিতে শক্তিক্ষয় না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা শক্তিসংরক্ষার উপদেশ সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।"

স্বামীজী বাঙ্গালাদেশের পল্লিগ্রাম ও তথাকার লোকদের কতকগুলি আচরণের উপর বড় একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। পল্লিগ্রামের একই পুষ্করিণীতে স্নান, জলসৌচ প্রভৃতি এবং সেই পুকুরের জলই পান করার প্রথার উপর তিনি ভারি বিরক্ত ছিলেন। প্রায়ই বলিতেন, "যাহাদের মস্তিষ্ক মলমূত্রে পরিপূর্ণ, তাহাদের আশা-ভরসা আর কোথায়? আবার ঐ যে পাঁড়াগেয়ে লোকদের অনধিকার চর্চ্চা করা, উহা অত্যন্ত খারাপ। শহরের লোকেরও যে অনধিকার চর্চ্চা নাই, তাহা নহে। তবে তাহাদের সময় কম, কারণ শহরে খরচ বেশী; কাজেই খাটুনিও বেশী। সে খাটুনি

খেটে, বড়ে টেপা, তামাক খাওয়া ও পরনিন্দা করবার আর সময় থাকে না। নইলে শহুরে ভূতগুলো ঐ বিষয়ে পাড়াগেঁয়ে ভূতের ঘাড়ে চড়ে বেড়াত।"

স্বামীজীর এক এক দিনের এইরূপ কথাবার্ত্তা ধরিয়া রাখিতে পারিলে এক এক খানি পুস্তক হইত। একই প্রশ্নের বারবার একই ভাবে উত্তর দেওয়া এবং একই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝান তাঁহার রীতি ছিল না। যতবারই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ততবারই উহা নূতন ভাবে নূতন দৃষ্টান্ত-সহায়ে এম্‌নি বলিবার ক্ষমতা ছিল যে, উহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া লোকের বোধ হইত এবং তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে ক্লান্তিবোধ দূরে থাকুক, আগ্রহ ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। বক্তৃতা করা সম্বন্ধেও তাঁহার ঐ প্রথা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবার বিষয়গুলি (points) লিখিয়া তিনি কোনকালে বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হাসি-তামাসা, সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা এবং বক্তৃতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধহীন বিষয়সকল লইয়াও চর্চ্চা করিতেন। বক্তৃতায় কি যে বলিবেন তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। আমরা যে কয়েকটি দিন তাঁহার সংস্পর্শে থাকিয়া ধন্য হইয়াছিলাম, সেই কয়েকটি দিনের কথাবার্ত্তার বিবরণ আরও যতদূর পারি, ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সহায়ে হিন্দুধর্ম্ম বুঝাইতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে স্বামীজীর মত আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। তারই দু-চারটি কথা আজ উপহার দিবার ইচ্ছা। কিন্তু বুঝিতে হইবে, আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাহাই লিখিতেছি। অতএব যদি ইহাতে কোনরূপ ভুল থাকে, তাহা আমার বুঝিবার ভুল, স্বামীজীর ব্যাখ্যার নহে।

স্বামীজী বলিতেন,—"চেতন অচেতন, স্থূল সূক্ষ্ম সবই একত্বের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যত রকম রকম জিনিস দেখিতে লাগিল, তাহাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিস মনে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। পরে বিচার করিয়া ঐ সমস্ত জিনিসগুলি ৬৩টা মূলদ্রব্য (element) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থির করিল।

"ঐ মূলদ্রব্যগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্রদ্রব্য (compound) বলিয়া এখন অনেকের সন্দেহ হইতেছে। আর যখন রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌঁছিবে, তখন সকল জিনিসই এক জিনিসেরই অবস্থাভেদমাত্র বুঝা যাইবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তাড়িত (heat, light and electricty) বিভিন্ন জিনিস বলিয়া সকলে জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, ঐগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। লোকে প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলি চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিল। তারপর দেখিল যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে,—অন্য সকল চেতন প্রাণীর ন্যায়, গমনশক্তি নাই মাত্র। তখন খালি দুইটি শ্রেণী রহিল, —চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাইবে, আমরা যাহাকে অচেতন বলি, তাহাদেরও স্বল্পবিস্তর চৈতন্য আছে।[১]

পৃথিবীতে যে উচ্চ-নিম্ন জমি দেখা যায়, তাহাও সতত সমতল হইয়া একভাবে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ষার জলে পর্ব্বতাদি উচ্চ জমি ধুইয়া গিয়া গহ্বরসকল পলিতে পূর্ণ হইতেছে। একটা উষ্ণ জিনিস কোন জায়গায় রাখিলে উহা ক্রমে চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যের ন্যায় সমান উষ্ণভাব

১ স্বামীজী যখন পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলেন তখন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু-প্রচারিত তাড়িত-প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতনস্বরূপ (Response of Inorganic matter to Electric currents) অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই।

ধারণ করিতে চেষ্টা করে। উষ্ণতাশক্তি এইরূপে সঞ্চালন, সংবাহন, বিকিরণাদি (conduction, convection and radiation) উপায়-অবলম্বনে সর্ব্বদা সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

"গাছের ফল ফুল পাতা শিকড় আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও বাস্তবিক উহারা যে এক, বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিয়াছে। ত্রিকোণ কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিলে এক সাদা রং রামধনুর সাতটা রঙের মত পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত দেখায়। সাদা চক্ষে দেখিলে একই রং, আবার লাল বা নীল চশমার ভিতর দিয়া দেখিলে সমস্তই লাল বা নীল দেখায়।

"এইরূপ যাহা সত্য, তাহা এক। মায়া দ্বারা আমরা পৃথক্ পৃথক্ দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মানুষের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজ্ঞান উপস্থিত হইলেও মানুষ সেই সত্যকে ধরিতে পারে না, দেখিতে পায় না।"

এইসব কথা শুনিয়া বলিলাম, "স্বামীজী, আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? দুখানা রেল আনিয়া সমান্তরালে রাখিলে দেখায় যেন উহারা ক্রমে এক জায়গায় মিলিয়া গিয়াছে। উহারই নাম vanishing point. মরীচিকা, রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি optical delusion (দৃষ্টিবিভ্রম) সর্ব্বদাই হইতেছে। Calcspar নামক পাথরের নীচে একটা রেখাকে double refraction-এ দুটো দেখায়। একটা উড্‌পেন্সিল আধ-গ্লাস জলে ডুবাইয়া রাখিলে পেন্সিলের জলমগ্ন ভাগটা উপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চোখগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাবিশিষ্ট এক একটা লেন্স (lens) মাত্র। আমরা কোন জিনিস যত বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাহাই তদপেক্ষা বড় দেখিয়া থাকে, কেন-না তাহাদের চোখের লেন্স বিভিন্নশক্তিবিশিষ্ট। অতএব আমরা যাহা স্বচক্ষে

দেখি, তাই যে সত্য তাহারও ত প্রমাণ নেই। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, মানুষ সত্য সত্য করিয়া পাগল কিন্তু প্রকৃত সত্য (Absolute Truth) মানুষের বুঝিবার ক্ষমতা নাই, কারণ ঘটনাক্রমে প্রকৃত সত্য মানুষের হস্তগত হইলে তাহাই যে বাস্তবিক সত্য, ইহা সে বুঝিবে কি করিয়া? আমাদের সমস্ত জ্ঞান relative (আপেক্ষিক), Absolute বুঝিবার ক্ষমতা নাই। অতএব Absolute ভগবান্ বা জগৎকারণকে মানুষ কখনই বুঝিতে পারিবে না।"

স্বামীজী বলিলেন, "তোমার বা সচরাচর লোকের Absolute জ্ঞান না থাকিতে পারে, তাই বলিয়া কাহারও নাই, এমন কথা কি করিয়া বল? অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া দুইরকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাহাকে জ্ঞান বল, বাস্তবিক উহা মিথ্যাজ্ঞান। সত্যজ্ঞানের উদয় হইলে উহা অন্তর্হিত হয়, তখন সব এক দেখায়। দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞানপ্রসূত।"

আমি উত্তর করিলাম, "স্বামীজী, এ তো বড় ভয়ানক কথা! যদি জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান দুইটি জিনিস থাকে, তাহা হইলে আপনি যাহাকে সত্যজ্ঞান ভাবিতেছেন, তাহাও ত মিথ্যাজ্ঞান হইতে পারে, আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বলিতেছেন, তাহাও ত সত্য হইতে পারে?"

তিনি বলিতেন, "ঠিক বলেছ, সেইজন্যই বেদে বিশ্বাস করা চাই। আমাদের পূর্ব্বকালে মুনিঋষিগণ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়া ঐ অদ্বৈত সত্য অনুভব করিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, আমাদের বিচার করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। যতক্ষণ না ঐ দুই অবস্থার পারে গিয়া দাঁড়াইয়া—ঐ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিব, ততক্ষণ কেমন

করিয়া বলিব—কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য ? শুধু দুইটি বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হইতেছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাক, তখন অন্যটাকে ভুল বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নে হয়ত কলিকাতায় কেনাবেচা করিলে, উঠিয়া দেখ বিছানায় শুইয়া আছ। যখন সত্যজ্ঞানের উদয় হইবে, তখন এক ভিন্ন দুই দেখিবে না ও পূর্ব্বের দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিবে। কিন্তু এসব অনেক দূরের কথা, হাতেখড়ি হইতে না হইতেই রামায়ণ, মহাভারত পড়িবার ইচ্ছা করিলে চলিবে কেন ? ধর্ম্ম অনুভবের জিনিস, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার নহে। হাতেনাতে করিতে হইবে, তবে ইহার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবে। এ কথা তোমাদের পাশ্চাত্ত্য Chemistry (রসায়ন), Physics (পদার্থবিদ্যা), Geology (ভূতত্ত্ববিদ্যা) প্রভৃতির অনুমোদিত। দু' বোতল hydrogen (উদজান) আর এক বোতল oxygen (অম্লজান) লইয়া 'জল কই' বলিলে কি জল হইবে, না তাহাদের একটা শক্ত জায়গায় রাখিয়া electric current (তাড়িত-প্রবাহ) তাহার ভিতর চালাইয়া তাহাদের combination (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) করিলে তবে জল দেখিতে পাইবে ও বুঝিবে যে, জল hydrogen ও oxygen নামক গ্যাস হইতে উৎপন্ন। অদ্বৈত জ্ঞান উপলব্ধি করিতে গেলেও সেইরূপ ধর্ম্মে বিশ্বাস চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণে যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশ বৎসরের অভ্যাসের ত কথাই নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্ম্মফল পিঠে বাঁধা রহিয়াছে। একমুহূর্ত্ত শ্মশানবৈরাগ্য হইল, আর বলিলে কি-না, 'কই, আমি ত সব এক দেখিতেছি না।' "

আমি বলিলাম, "স্বামীজী, আপনার ঐ কথা সত্য হইলে যে

Fatalism (অদৃষ্টবাদ) আসিয়া পড়ে। যদি বহু জন্মের কর্ম্মফল একজন্মে যাইবার নয়, তবে আর চেষ্টা আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হইবে, তখন আমারও হইবে।"

তিনি বলিলেন, "তাহা নহে। কর্ম্মফল ত অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু অনেক কারণে ঐসকল কর্ম্মফল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইতে পারে। ম্যাজিক-লণ্ঠনের পঞ্চাশখানা ছবি দশ মিনিটেও দেখান যায়, আবার দেখাতে দেখাতে সমস্ত রাতও কাটান যায়। উহা নিজের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।"

সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধেও স্বামীজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর—"সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই চেতন ও অচেতন (সুবিধার জন্য) দুইভাগে বিভক্ত। মানুষ সৃষ্টবস্তুর চেতনভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্ম্মের মতে, ঈশ্বর আপনার মত রূপবিশিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন; কেহ বলেন, মানুষ ল্যাজবিহীন বানরবিশেষ; কেহ বলেন, মানুষেরই কেবল বিবেচনাশক্তি আছে, তাহার কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশী। যাহাই হউক, মানুষ প্রাণিবিশেষ ও প্রাণিসমূহ সৃষ্ট পদার্থের অংশমাত্র, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। এখন সৃষ্ট পদার্থ কি, বুঝিবার জন্য একদিকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া এটা কি, ওটা কি, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; আর অন্যদিকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ হাওয়ায় ও উর্ব্বরা ভূমিতে শরীররক্ষার জন্য যৎসামান্য সময়মাত্র ব্যয় করিয়া কৌপীন পরিয়া প্রদীপের মিট্‌মিটে আলোতে বসিয়া আদা-জল খাইয়া বিচার করিতে লাগিলেন,—এমন জিনিস কি আছে, যাহা জানিলে সব জিনিস জানা যায় (What is that by knowing which everything will be known ?) ? তাঁহাদের মধ্যে

অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্ব্বাকের দৃষ্টসত্য মত (Ultra-materialistic Theory) হইতে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মত পর্যান্ত সমস্তই আমাদের ধর্ম্মে পাওয়া যায়। দুই দলই ক্রমে এক জায়গায় উপনীত হইতেছেন ও এক কথাই এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দুই দলই বলিতেছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনির্ব্বচনীয় অনাদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশমাত্র। কাল এবং আকাশও (time and space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক কাল, যাহার অনুভবে সূর্য্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়, ভাবিয়া দেখিলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য্য অনাদি নহে; এমন সময় অবশ্য ছিল, যখন সূর্য্যের সৃষ্টি হয় নাই। আবার এমন সময় আসিবে, যখন আবার সূর্য্য থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলে অখণ্ড সময় একটি অনির্ব্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি? আকাশ বা অবকাশ বলিলে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎসম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র সৃষ্টির অংশমাত্র বই আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেথানে কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই। অতএব অনন্ত আকাশও সময়ের মত অনির্ব্বচনীয় একটি ভাব বা বস্তুবিশেষ। এখন সৌরজগৎ ও সৃষ্টবস্তু কোথা হইতে কিরূপে আসিল? সাধারণতঃ আমরা কর্ত্তা ভিন্ন ক্রিয়া দেখিতে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কর্ত্তা আছেন, কিন্তু তাহা হইলে সৃষ্টিকর্ত্তারও ত সৃষ্টিকর্ত্তা আবশ্যক, তাহা থাকিতে পারে না। অতএব আদিকারণ, সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্ব্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ। অনন্তের ত বহুত্ব সম্ভবে না, তাই ঐসকল অনন্ত পদার্থই এক এবং একই ঐসকল-রূপে প্রকাশিত।"

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "স্বামীজী, মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস, যাহা সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহা কি সত্য ?"

তিনি উত্তর করিলেন, "সত্য না হইবার ত কোন কারণ দেখি না। তোমাকে কেহ করুণস্বরে মিষ্টভাষায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও আর কঠোর তীব্রভাষায় কোন কথা বলিলে তোমার রাগ হয়। তখন প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও যে সুললিত উত্তম শ্লোক (যাহাকে মন্ত্র বলে) দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহার মানে কি ?"

এইসকল কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "স্বামীজী, আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় ত আপনি সবই বুঝিতে পারিতেছেন, এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য, আপনি বলিয়া দিন।"

স্বামীজী বলিলেন, "প্রথমে মনটাকে বশে আনিতে চেষ্টা কর, তা যে উপায়েই হোক্, পরে সব আপনিই হইবে। আর জ্ঞান—অদ্বৈত জ্ঞান ভারি কঠিন ; জানিয়া রাখ যে উহাই মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (highest ideal), কিন্তু ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা ও আয়োজনের আবশ্যক। সাধুসঙ্গ ও যথার্থ বৈরাগ্য ভিন্ন উহা অনুভবের অন্য উপায় নাই।"

স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি

সে আজ ষোড়শ বর্ষ পূর্ব্বের কথা।[১] ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দেশ বিজয় করিয়া সবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। যখন হইতে স্বামীজী চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের বিজয়কেতন উড়াইয়াছেন, তখন হইতেই তৎসম্বন্ধীয় যে-কোন বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিতেছি। তখন ২।৩ বৎসর মাত্র কলেজ ছাড়িয়াছি—কোনরূপ অর্থোপার্জ্জনাদিও করি না—সুতরাং কখনও বন্ধুবান্ধবদের বাটী গিয়া, কখনও বা বাটীর নিকটস্থ ধর্ম্মতলায় 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর্' অফিসের বহির্দেশে বোর্ডসংলগ্ন 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর্' পত্রিকায় স্বামীজীর সম্বন্ধে যে-কোন সংবাদ বা তাঁহার যে-কোন বক্তৃতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করি। এইরূপে স্বামীজী ভারতে পদার্পণ করা অবধি সিংহলে বা মাদ্রাজে যাহা কিছু বলিয়াছেন, প্রায় সব পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আলমবাজার মঠে গিয়া তাঁহার গুরুভাইদের নিকট এবং মঠে যাতায়াতকারী বন্ধুবান্ধবদের নিকটও তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্রসমূহ যথা—বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, থিওজফিষ্ট প্রভৃতি—যাঁহার যেরূপ ভাব—তদনুসারে কেহ বিদ্রূপচ্ছলে, কেহ উপদেশদানচ্ছলে, কেহ বা মুরুব্বিয়ানা ধরণে—যিনি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতেছেন, তাহারও প্রায় কিছুই জানিতে বাকি নাই।

১ সন ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসের 'উদ্বোধনে' এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি

আজ সেই স্বামী বিবেকানন্দ শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতা নগরীতে পদার্পণ করিবেন, আজ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে, তাই প্রত্যূষে উঠিয়াই শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এত প্রত্যূষেই স্বামীজীর অভ্যর্থনার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। অনেক পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ইংরেজীতে মুদ্রিত দুইটি কাগজ বিতরিত হইতেছে। পড়িয়া দেখিলাম, লণ্ডনবাসী ও আমেরিকাবাসী তাঁহার ছাত্রবৃন্দ তাঁহার বিদায়কালে তাঁহার গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে অভিনন্দনপত্রদ্বয় প্রদান করেন, ঐ দুইটি তাহাই। ক্রমে স্বামীজীর দর্শনার্থী লোকসমূহ দলে দলে সমাগত হইতে লাগিল। ষ্টেশন-প্লাটফর্ম্ম লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেই পরস্পরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্বামীজীর আসিবার আর কত বিলম্ব। শুনা গেল, তিনি একখানা স্পেশ্যাল ট্রেনে আসিবেন, আসিবার আর বিলম্ব নাই। ঐ যে—গাড়ীর শব্দ শুনা যাইতেছে, ক্রমে সশব্দে ট্রেন প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল।

স্বামীজী যে গাড়ীখানিতে ছিলেন, সেটি যেখানে আসিয়া থামিল, সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলাম। যাই গাড়ী থামিল, দেখিলাম স্বামীজী দাঁড়াইয়া সমবেত সকলকে করযোড়ে প্রণাম করিলেন। এই এক প্রণামেই স্বামীজী আমার হৃদয় আকর্ষণ করিলেন। তখন ট্রেনমধ্যস্থ স্বামীজীর মূর্ত্তি মোটামুটি দেখিয়া লইলাম। তার পরেই অভ্যর্থনাসমিতির শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহাকে ট্রেন হইতে নামাইয়া কিছুদূরবর্ত্তী একখানি গাড়ীতে উঠাইলেন। অনেকে স্বামীজীকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

সেখানে খুব ভিড় জমিয়া গেল। এদিকে দর্শকগণের হৃদয় হইতে স্বতঃই "জয় স্বামী বিবেকানন্দজী কী জয়," "জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কী জয়"—এই আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। আমিও প্রাণ ভরিয়া সেই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়া জনতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন ষ্টেশনের বাহিরে পঁহুছিয়াছি, তখন দেখি অনেকগুলি যুবক স্বামীজীর গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। আমিও তাহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম, ভিড়ের জন্য পারিলাম না। সুতরাং সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে দূরে স্বামীজীর গাড়ীর সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ষ্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনার্থ একটি হরিনামসংকীর্ত্তনদলকে দেখিয়াছিলাম। রাস্তায় একটি ব্যাণ্ড বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্বামীজীর সঙ্গে চলিল, দেখিলাম। রিপণ কলেজ পর্য্যন্ত রাস্তা নানাবিধ পতাকা, লতা, পাতা ও পুষ্পে সজ্জিত হইয়াছিল। গাড়ী আসিয়া রিপণ কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। এইবার স্বামীজীকে বেশ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। দেখিলাম, তিনি মুখ বাড়াইয়া কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন। মুখখানি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফাটিয়া বাহির হইতেছে, তবে পথের শ্রান্তিতে কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মাক্ত ও মলিন হইয়াছে মাত্র। দুইখানি গাড়ী—একটিতে স্বামীজী এবং মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার—মাননীয় চারুচন্দ্র মিত্র ঐ গাড়ীতে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া জনতাকে নিয়মিত করিতেছেন। অপরটিতে—গুডউইন, হ্যারিসন (সিংহল হইতে স্বামীজীর সঙ্গী জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সাহেব), জি. জি., কিডি ও আলাসিঙ্গা নামক তিনজন মাদ্রাজী শিষ্য এবং ত্রিগুণাতীত স্বামী।

যাহা হউক, অল্পক্ষণ গাড়ী দাঁড়াইবার পরই অনেকের অনুরোধে

স্বামীজী রিপণ কলেজ-বাটীতে প্রবেশ করিয়া সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া দুই-তিন মিনিট ইংরেজীতে একটু বলিয়া আবার ফিরিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এবার আর শোভাযাত্রা করা হইল না। গাড়ী বাগবাজারে পশুপতি বাবুর বাটীর দিকে ছুটিল। আমিও মনে মনে স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

* * *

আহারাদির পর মধ্যাহ্নে চাঁপাতলায় খগেনদের (স্বামী বিমলানন্দ) বাটীতে গেলাম। তথা হইতে খগেন ও আমি তাহাদের একখানি টমটমে চড়িয়া পশুপতি বসুর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। স্বামীজী উপরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, বেশী লোকজনকে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত পরিচিত স্বামীজীর অনেক গুরুভাই-এর সাক্ষাৎ হইল। স্বামী শিবানন্দ আমাদিগকে স্বামীজীর নিকট লইয়া গেলেন এবং পরিচয় করিয়া দিলেন—"এরা আপনার খুব admirer."

স্বামীজী ও যোগানন্দ স্বামী পশুপতি বাবুর দ্বিতলস্থ একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পাশাপাশি দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। অন্যান্য স্বামিগণ উজ্জ্বল গৈরিক-বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছিলেন। মেজে কার্পেট-মোড়া ছিল। আমরা প্রণাম করিয়া সেই কার্পেটের উপর উপবেশন করিলাম। স্বামীজী যোগানন্দ স্বামীর সহিত তখন কথা কহিতেছিলেন। আমেরিকা-ইউরোপে স্বামীজী কি দেখিলেন, এই প্রসঙ্গ হইতেছিল। স্বামীজী বলিতেছিলেন—

"দেখ্ যোগে, দেখ্‌লুম কি জানিস্?—সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা কচ্ছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটেকে religion-এর দিকে manifest করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্তাদেশীয়েরা সেইটেকেই

মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest কচ্ছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র।"

খগেনের দিকে চাহিয়া তাহাকে খুব রোগা দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, "এ ছেলেটিকে বড় sickly দেখ্ছি যে।"

স্বামী শিবানন্দ উত্তর করিলেন, "এটি অনেক দিন থেকে chronic dyspepsiaতে ভুগ্ছে।"

স্বামীজী বলিলেন, "আমাদের বাঙ্গালা দেশটা বড় sentimental কি-না, তাই এখানে এত dyspepsia."

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা প্রণাম করিয়া উঠিয়া বাটী ফিরিলাম।

*　　　　*　　　　*

স্বামীজী এবং তাঁহার শিষ্য মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার কাশীপুরে ৺গোপাললাল শীলের বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। স্বামীজীর মুখের কথাবার্ত্তা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য ঐ স্থানে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে করিয়া কয়েকদিন গিয়াছিলাম। তাহার যতগুলি স্মরণ হয়, এইবার তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কথোপকথন হয়—প্রথম এই বাগান-বাটীর একটি ঘরে। স্বামীজী আসিয়া বসিয়াছেন, আমিও গিয়া প্রণাম করিয়া বসিয়াছি, সেখানে আর কেহ নাই। হঠাৎ কেন জানি না—স্বামীজী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি তামাক খাস্?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে না।"

তাহাতে স্বামীজী বলিলেন, "হাঁ, অনেকে বলে—তামাকটা খাওয়া ভাল নয়—আমিও ছাড়্বার চেষ্টা কচ্ছি।"

আর একদিন স্বামীজীর নিকট একটি বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তাঁহার

সহিত স্বামীজী কথা কহিতেছেন। আমি একটু দূরে রহিয়াছি, আর কেহ নাই। স্বামীজী বলিতেছেন, "বাবাজী, আমেরিকাতে আমি একবার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতা শুনে একজন পরমাসুন্দরী যুবতী—অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এক নির্জ্জন দ্বীপে গিয়ে কৃষ্ণধ্যানে উন্মত্তা হলেন।" তারপর স্বামীজী ত্যাগ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, যে-সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ত্যাগের ভাবের তেমন উজ্জ্বলরূপে প্রচার নাই, তাহাদের ভিতর শীঘ্রই অবনতি এসে থাকে—যথা, বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়।"

আর একদিন গিয়াছি। দেখি, অনেকগুলি লোক বসিয়া আছেন এবং একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। যুবকটি বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটির গৃহে থাকে। সে বলিতেছে, আমি নানা সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছি, কিন্তু সত্য কি নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।

স্বামীজী অতি স্নেহপূর্ণস্বরে বলিতেছেন, "দেখ বাবা, আমারও একদিন তোমারই মত অবস্থা ছিল—তা তোমার ভাবনা কি? আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন লোকে তোমাকে কি কি বলেছিল এবং তুমি কি রকমই বা করেছিলে, বল দেখি?"

যুবক বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমাদের সোসাইটিতে ভবানীশঙ্কর নামক একজন পণ্ডিত প্রচারক আছেন, তিনি আমায় মূর্ত্তিপূজার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির যে বিশেষ সহায়তা হয়, তাহা সুন্দররূপে বুঝিয়ে দিলেন, আমিও তদনুসারে দিন কতক খুব পূজা-অর্চ্চনা কর্‌তে লাগ্‌লুম, কিন্তু তাতে শান্তি পেলুম না। সেই সময় একজন আমাকে উপদেশ দিলেন, 'দেখ, মনটাকে একেবারে শূন্য কর্‌বার চেষ্টা কর দেখি—তাতে পরম শান্তি পাবে।' আমি দিন কতক সেই চেষ্টাই কর্‌তে লাগলুম, কিন্তু

তাতেও আমার মন শান্ত হোল না। আমি, মহাশয়, এখনও একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে যতক্ষণ সম্ভব বসে থাকি, কিন্তু শান্তিলাভ কিছুতেই হচ্ছে না। বল্‌তে পারেন, কিসে শান্তি হয়?"

স্বামীজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বাপু, আমার কথা যদি শুন, তবে তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখ্‌তে হবে। তোমার বাড়ীর কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পীড়িত, তাকে ঔষধ পথ্য যোগাড় করে দিলে ও শরীরের দ্বারা সেবাশুশ্রূষা করলে। যে খেতে পাচ্ছে না, তাকে খাওয়ালে। যে অজ্ঞান, তাকে—তুমি যে এত লেখাপড়া শিখেছ—মুখে মুখে যতদূর হয় বুঝিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ যদি চাও বাপু, তা হলে এইভাবে যথাসাধ্য লোকের সেবা করতে পারলে তুমি মনের শান্তি পাবে।"

যুবকটি বলিল, "আচ্ছা মহাশয়, ধরুন আমি একজন রোগীর সেবা করতে গেলাম, কিন্তু তার জন্য রাত জেগে, সময়ে না খেয়ে, অত্যাচার করে, আমার নিজেরই যদি রোগ হয়ে পড়ে?"

স্বামীজী এতক্ষণ যুবকটির সহিত স্নেহপূর্ণস্বরে সহানুভূতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। এই শেষ কথাটিতে একটু বিরক্ত হইলেন, বোধ হইল। তিনি একটু বিদ্রূপের ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—

"দেখ বাপু, রোগীর সেবা করতে গিয়ে তুমি তোমার নিজের রোগের আশঙ্কা করছ, কিন্তু তোমার কথাবার্ত্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমার বোধ হচ্ছে এবং উপস্থিত যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও সকলে বেশ বুঝতে পারছেন যে, তুমি এমন জোরে রোগীর সেবা কোন কালে করবে না, যাতে তোমায় নিজের রোগ হয়ে যাবে।"

যুবকটির সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না। আমরা বুঝিলাম, লোকটি 'জাঁতি' শ্রেণীর লোক; অর্থাৎ জাঁতি যেমন যাহা পায় তাহাই কাটে, সেইরূপ একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা কোন সদুপদেশ শুনিলেই তাহার খুঁত কাটে বা ঐ উপদিষ্ট বিষয়ের মধ্যে দোষভাগ দেখিতেই অগ্রে ছুটিয়া যায় এবং যত ভাল কথাই তাহাদের বল না কেন, সব তর্কযুক্তি করিয়া কাটিয়া দেয়।

আর একদিন মাষ্টার মহাশয়ের ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণেতা শ্রীম—র) সঙ্গে কথা হইতেছে। মাষ্টার মহাশয় বলিতেছেন, "দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে ত মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটান, তখন ওসব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?"

স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন, "মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা ত নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি?"

মাষ্টার মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি বুঝিলাম, মাষ্টার মহাশয় দয়া সেবা পরোপকার ইত্যাদি ছাড়িয়া সর্ব্ববিধ অধিকারীর জন্যই জপ তপ ধ্যান ধারণা বা ভক্তির ব্যবস্থা করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু স্বামীজীর মতে মুক্তিলাভের জন্য ঐগুলির অনুষ্ঠান একপ্রকার অধিকারীর পক্ষে যেরূপ একান্ত আবশ্যক, এমন অনেক অধিকারী আছে যাহাদের পক্ষে আবার পরোপকার দান সেবা ইত্যাদির তদ্রূপই প্রয়োজন। একটিকে উড়াইয়া দিতে গেলে অপরটিকেও উড়াইয়া দিতে হয়, একটিকে লইলে অপরটিকে না লইয়া উপায় নাই। স্বামীজীর

ঐরূপ প্রত্যুত্তরে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল, মাষ্টার মহাশয় দয়া-সেবাদিকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়া অথচ ধ্যান-ভজনাদিকে রাখিয়া সঙ্কীর্ণভাবের পোষকতা করিতেছিলেন। স্বামীজীর উদার হৃদয় ও ক্ষুরধার বুদ্ধি যেন তাহা সহ্য করিতে পারিল না। তিনি মুক্তিলাভের চেষ্টাকে পর্য্যন্ত মায়ার অন্তর্গত বলিয়া অদ্ভুত যুক্তিদ্বারা নির্দ্ধারিত করিলেন এবং দয়া-সেবাদির সহিত উহাকে একশ্রেণীভুক্ত করিয়া কর্ম্মযোগের পথিককে পর্য্যন্ত আশ্রয় দিলেন।

Thomas â Kempis-এর 'Imitation of Christ'-এর প্রসঙ্গ উঠিল। অনেকেই জানেন, স্বামীজী সংসার ত্যাগ করিবার কিছু পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে চর্চ্চা করিতেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তাঁহার গুরুভাইরাও স্বামীজীর দৃষ্টান্তে ঐ গ্রন্থটি সাধক-জীবনের বিশেষ সহায়ক জ্ঞানে সদা সর্ব্বদা উহার আলোচনা করিতেন। স্বামীজী ঐ গ্রন্থের এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে, তদানীন্তন 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে উহার একটি সূচনা লিখিয়া 'ঈশানুসরণ' নামে ধারাবাহিক অনুবাদ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। সূচনাটি পড়িলেই স্বামীজী ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে কিরূপ গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, বুঝা যায়। বাস্তবিকই উহাতে বিবেক বৈরাগ্য দীনতা দাস্যভক্তি আত্তি প্রভৃতির এত শত শত জ্বলন্ত উপদেশ আছে যে, যিনিই উহা পাঠ করিবেন, তাঁহারই হৃদয়ে সেই ভাব কিছু না কিছু উদ্দীপিত হইবেই হইবে। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বোধ হয় স্বামীজীর উক্ত গ্রন্থের উপর এখন কিরূপ ভাব জানিবার জন্য উহার ভিতরে দীনতার যে উপদেশ আছে, তাহার প্রসঙ্গ পাড়িয়া বলিলেন,—নিজেকে এইরূপ একান্ত হীন ভাবিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর হইবে? স্বামীজী শুনিয়া বলিতে

লাগিলেন, "আমরা আবার হীন কিসে? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায়? আমরা যে জ্যোতির রাজ্যে বাস করছি, আমরা যে জ্যোতির তনয়।"

তাঁহার ঐরূপ প্রত্যুত্তরে বুঝিলাম, স্বামীজী উক্ত গ্রন্থোক্ত ঐ প্রাথমিক সাধন-সোপান অতিক্রম করিয়া সাধন-রাজ্যের কত উচ্চ ভূমিতে তখন উপনীত হইয়াছেন!

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম, সংসারের অতি সামান্য ঘটনাও তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারিত না, উহাদেরও সহায়তায় তিনি উচ্চ ধর্ম্মভাব-প্রচারের চেষ্টা করিতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মঠের প্রাচীন সাধুগণ যাঁহাকে রামলাল দাদা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, দক্ষিণেশ্বর হইতে একদিন স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী একখানি চেয়ার আনাইয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন ও স্বয়ং পায়চারি করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাবিনম্র দাদা তাহাতে একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি বসুন, আপনি বসুন।" স্বামীজী কিন্তু কোনমতে ছাড়িবার পাত্র নহেন, অনেক বলিয়া কহিয়া দাদাকে চেয়ারে বসাইলেন ও স্বয়ং বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন "গুরুবৎ গুরু-পুত্রেষু।" দেখিলাম, এত ঐশ্বর্য্য, এত মান পাইয়াও আমাদের স্বামীজীর এতটুকু অভিমানের আবির্ভাব হয় নাই! আরও বুঝিলাম, গুরুভক্তি এইরূপেই করিতে হয়।

অনেকগুলি ছাত্র আসিয়াছে। স্বামীজী একখানি চেয়ারে ফাঁকায় বসিয়া আছেন। সকলেই তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার দুটো কথা শুনিবার জন্ত উদ্‌গ্রীব, অথচ সেখানে আর কোন আসন নাই, যাহাতে

ছেলেদের বসিতে বলিতে পারেন, কাজেই তাহাদিগকে ভূমিতে বসিতে হইল। স্বামীজীর বোধ হয় মনে হইতেছিল, ইহাদিগকে বসিবার কোন আসন দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু আবার বুঝি তাঁহার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তা বেশ, তোমরা বেশ বসেছো, একটু একটু তপস্যা করা ভাল।"

আমাদের পাড়ার চণ্ডীচরণ বর্দ্ধনকে একদিন লইয়া গিয়াছি। চণ্ডী বাবু Hindu Boys' School নামক একটি ছোটখাট বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী, তাহাতে ইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করান হয়। তিনি পূর্ব্ব হইতেই খুব ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন, পরে স্বামীজীর বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া তাঁহার উপর খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন। পূর্ব্বে সময়ে সময়ে ধর্ম্মসাধনের জন্য ব্যাকুল হইয়া সংসার-পরিত্যাগেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হন নাই। দিন কতক সখের থিয়েটারে অভিনয়াদি এবং এক-আধখানি নাটক রচনাও করিয়াছিলেন। ইনি একটু ভাবপ্রবণ ধাতের লোক ছিলেন। বিখ্যাত Democrat Edward Carpenter ভারত-ভ্রমণকালে ইঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় এবং তাঁহার 'Adam's Peak to Elephanta' নামক গ্রন্থে চণ্ডী বাবুর সহিত আলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাঁহার একখানি চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

চণ্ডী বাবু আসিয়া স্বামীজীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, কি রকম ব্যক্তিকে গুরু করা যেতে পারে?"

স্বামীজী বলিলেন, "যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিয়েছিলেন।"

চণ্ডী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা স্বামীজী, কৌপীন পর্‌লে কি কাম দমনের বিশেষ সহায়তা হয় ?"

স্বামীজী বলিলেন, "একটু-আধটু সাহায্য হতে পারে। কিন্তু যখন ঐ বৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে, তখন কি বাপ, কৌপীনে আটকায় ? মনটা ভগবানে একেবারে তন্ময় না হয়ে গেলে বাহ্য কোন উপায়ে কাম একেবারে যায় না। তবে কি জান—যতক্ষণ লোকে সেই অবস্থা সম্পূর্ণ লাভ না করে, ততক্ষণ নানা বাহ্য উপায়-অবলম্বনের চেষ্টা স্বভাবতঃই করে থাকে। আমার একবার এমন কামের উদয় হয়েছিল যে, আমি নিজের উপর মহা বিরক্ত হয়ে আগুনের মাল্‌সার উপর বসেছিলাম। শেষে ঘা শুকাতে অনেক দিন লাগে।"

ব্রহ্মচর্য্যসম্বন্ধে চণ্ডী বাবু স্বামীজীকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, স্বামীজীও অতি সরলভাবে সব কথা বুঝাইয়া উত্তর দিতে লাগিলেন। চণ্ডী বাবু ধর্ম্মসাধনার জন্য অকপটভাবে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু গৃহী বলিয়া সব সময় মনের মত উহার সাধনা করিতে পারিতেন না, বিশেষতঃ, ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মসাধনে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া দৃঢ় ধারণা থাকিলেও কার্য্যকালে সম্পূর্ণভাবে তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। অধিকন্তু ছেলেদের লইয়া সদা সর্ব্বদা অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকায়, ধর্ম্মসাধনা ও সংশিক্ষার অভাবে এবং কুসঙ্গের প্রভাবে অতি অল্পবয়স হইতেই তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য কিরূপে নষ্ট হয়, তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন এবং কি উপায়ে উহা তাহাদের ভিতর পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। কিন্তু 'স্বয়ং অসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়েৎ ?' সুতরাং কোনরূপে নিজের ও পরের ভিতর ব্রহ্মচর্য্যভাব প্রবেশ করাইতে অসমর্থ হইয়া সময় সময় বড়ই কাতর হইতেন, এক্ষণে পরম ব্রহ্মচারী স্বামীজীর

অকপট উপদেশাবলী ও ওজস্বিনী বাণী শ্রবণ করিয়া হঠাৎ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল, এই মহাপুরুষ একবার মনে করিলে আমাদের ও বালকগণের ভিতর সেই প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্য্যভাব নিশ্চিত উদ্দীপিত করিয়া দিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইনি একটু ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। হঠাৎ পূর্ব্বোক্তভাবে উত্তেজিত হইয়া ইংরেজীতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Oh Great Teacher, tear up the veil of hypocrisy and teach the world the one thing needful—how to conquer lust". অর্থাৎ, হে আচার্য্যবর! যে কাপট্যের আবরণে আমাদিগকে যথার্থ গোপন করিয়া আমরা অন্যের নিকট শিষ্ট শান্ত বা সভ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতেছি, তাহা নিজ দিব্যশক্তিবলে ছিন্ন করিয়া ফেলুন এবং লোকের ভিতর যে ঘোর কাম-প্রবৃত্তি রহিয়াছে, যাহাতে তাহার সমূলে উৎপাটন হইতে পারে—তাহা শিক্ষা দিন্।

স্বামীজী চণ্ডী বাবুকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিলেন।

পরে Edward Carpenter-এর প্রসঙ্গ পড়িল। স্বামীজী বলিলেন, "লণ্ডনে ইনি অনেক সময় আমার কাছে এসে বসে থাক্‌তেন। আরও অনেক Socialist Democrat প্রভৃতি আস্‌তেন। তাঁরা বেদান্তোক্ত ধর্ম্মে তাঁদের নিজ নিজ মতের পোষকতা পেয়ে বেদান্তের উপর খুব আকৃষ্ট হতেন।"

স্বামীজী উক্ত Carpenter সাহেবের 'Adam's Peak to Elephanta' নামক গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলেন। এইবার উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত চণ্ডী বাবুর ছবিটির কথা তাঁহার মনে পড়িল; বলিলেন, "আপনার চেহারা যে বই-এ আগেই দেখেছি।" আরও কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামীজী বিশ্রামের জন্য উঠিলেন। উঠিবার সময় চণ্ডী

বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চণ্ডী বাবু, আপনারা ত অনেক ছেলের সংস্রবে আসেন, আমায় গুটিকতক সুন্দর সুন্দর ছেলে দিতে পারেন?" চণ্ডী বাবু বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। স্বামীজীর কথার সম্পূর্ণ মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া স্বামীজী যখন বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিতেছেন, তখন অগ্রসর হইয়া তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন, "সুন্দর ছেলের কথা কি বলছিলেন?"

স্বামীজী বলিলেন, "চেহারা দেখতে ভাল, এমন ছেলে আমি চাচ্ছি না—আমি চাই বেশ সুস্থশরীর, কর্ম্মঠ, সৎপ্রকৃতি কতকগুলি ছেলে, তাদের trained করতে চাই, যাতে তারা নিজেদের মুক্তিসাধনের জন্য ও জগতের কল্যাণসাধনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।"

আর একদিন গিয়া দেখি, স্বামীজী ইতস্ততঃ বেড়াইতেছেন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ('স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা) স্বামীজীর সহিত খুব পরিচিতভাবে আলাপ করিতেছেন। স্বামীজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমাদের অতিশয় কৌতূহল হইল। প্রশ্নটি এই—অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষে পার্থক্য কি? আমরা শরৎ বাবুকে স্বামীজীর নিকট ঐ প্রশ্নটি উত্থাপিত করিতে বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি অগ্রসর হইয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা শরৎ বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বামীজীর নিকট যাইয়া, তিনি ঐ প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তাহা শুনিতে লাগিলাম। স্বামীজী উক্ত প্রশ্নের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "বিদেহমুক্তিই যে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা—এ আমার সিদ্ধান্ত, তবে আমি সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় নির্জ্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হল না বলে প্রায়োপবেশন করে দেহত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছি, কত ধ্যান,

কত সাধন-ভজন করেছি, কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্ত সে বিজাতীয় আগ্রহ নাই। এখন কেবল মনে হয়, যত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাক্‌ছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তির কোন প্রয়োজন নাই।"

আমি স্বামীজীর উক্ত কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ের অপার করুণার কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম; আরও ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কি নিজ দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারপুরুষের লক্ষণ বুঝাইলেন? ইনিও কি একজন অবতার? আরও মনে হইল, স্বামীজী এক্ষণে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় উঁহার মুক্তির জন্ত আর আগ্রহ নাই।

আর একদিন আমি ও খগেন (স্বামী বিমলানন্দ) সন্ধ্যার পর গিয়াছি। হরমোহন বাবু (ঠাকুরের ভক্ত) আমাদিগকে স্বামীজীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিবার জন্ত বলিলেন, "স্বামীজী, এঁরা আপনার খুব admirer এবং খুব বেদান্ত আলোচনা করেন।" হরমোহন বাবুর বাক্যের প্রথমাংশ সম্পূর্ণ সত্য হইলেও, দ্বিতীয়াংশটি কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত ছিল। কারণ, আমরা গীতাটাই তখন কতকটা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু বেদান্তের ছোটখাট কয়েকখানা গ্রন্থ ও দুই-একখানা উপনিষদের বঙ্গানুবাদ একটু-আধটু দেখা ছাড়া ঐসকল শাস্ত্র ছাত্রের মত উত্তমরূপে আলোচনা করি নাই অথবা মূল সংস্কৃতগ্রন্থ ভাষ্যাদির সাহায্যে পড়ি নাই। যাহা হউক, স্বামীজী বেদান্তের কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "উপনিষদ্ কিছু পড়েছ?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।"

স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ উপনিষদ্ পড়েছ?"

আমি মনের ভিতর হাতড়াইয়া আর কিছু না পাইয়া বলিয়া ফেলিলাম, "কঠ উপনিষদ্ পড়েছি।"

স্বামীজী বলিলেন, "আচ্ছা, কঠটাই বল, কঠ উপনিষদ্ খুব grand—কবিত্বপূর্ণ।"

কি সর্ব্বনাশ! স্বামীজী বুঝি মনে করিয়াছেন, কঠ উপনিষদ্ আমি কণ্ঠস্থ করিয়াছি; আমাকে তাহা হইতে খানিকটা আবৃত্তি করিতে বলিতেছেন। অথচ উহার সংস্কৃতটা একটু-আধটু দেখিলেও কখন অর্থ বুঝিয়া পড়িবার বা মুখস্থ করিবার চেষ্টা করি নাই। বড়ই ফাঁপড়ে পড়িলাম। কি করি! হঠাৎ একটি বুদ্ধি যোগাইল। ইহার কয়েক-বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যহ নিয়ম করিয়া কিছু কিছু গীতাপাঠ করিতাম। তাহার ফলে গীতার অধিকাংশই আমার কণ্ঠস্থ ছিল। ভাবিলাম, যাহা হউক কয়েকটা শাস্ত্রীয় শ্লোক আবৃত্তি না করিলে আর স্বামীজীর নিকট মুখ দেখাইবার জো নাই। সুতরাং বলিয়া ফেলিলাম, "কঠটা মুখস্থ নেই—গীতা থেকে খানিকটা বলি।"

স্বামীজী বলিলেন, "আচ্ছা, তাই বল।"

তখন গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগস্থ "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা" হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জ্জুনের সমুদয় স্তবটা আওড়াইয়া দিলাম।

শুনিয়া স্বামীজী উৎসাহ দিবার জন্য "বেশ, বেশ" বলিতে লাগিলেন। ইহার পরদিন বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজীর দর্শনার্থ গিয়াছি। রাজেনকে বলিয়াছি, "ভাই, কাল স্বামীজীর কাছে উপনিষদ্ নিয়ে বড় অপ্রস্তুত হয়েছি। তোমার নিকট উপনিষদ্ কিছু থাকে ত পকেটে করে নিয়ে চল। যদি কাল্‌কের মত উপনিষদের কথা পাড়েন ত তাই পড়লেই চল্‌বে।" রাজেনের নিকট একখানি প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী-কৃত ঈশকেনকঠাদি উপনিষদ্ ও তাহার বঙ্গানুবাদ পকেট এডিশন ছিল, সেটি পকেটে করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। অদ্য অপরাহ্নে একঘর লোক

বসিয়াছিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। আজও কিরূপে ঠিক স্মরণ নাই—কঠ উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠিল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে বাহির করিয়া ঐ উপনিষদের গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পাঠের অন্তরালে স্বামীজী নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা—যে শ্রদ্ধায় তিনি নির্ভীকচিত্তে যমভবনে যাইতেও সাহসী হইয়াছিলেন—বলিতে লাগিলেন। যখন নচিকেতার দ্বিতীয় বর স্বর্গপ্রাপ্তির কথা পড়া হইতে লাগিল, তখন সেইখানটা বেশী না পড়িয়া কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয় বরের স্থানটা পড়িতে বলিলেন।

নচিকেতা বলিতেছেন,—মৃত্যুর পর লোকের সন্দেহ—দেহ যাইলে কিছু থাকে কি-না—তার পর যমের নচিকেতাকে প্রলোভন-প্রদর্শন ও নচিকেতার দৃঢ়ভাবে তৎসমুদয় প্রত্যাখ্যান। এইসব খানিকটা পড়া হইলে স্বামীজী তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ঐ সম্বন্ধে কত কি বলিলেন—ক্ষীণস্মৃতি ষোড়শবর্ষে তাহার আর কিছু চিহ্ন রাখে নাই।

কিন্তু এই দুই দিনের উপনিষৎপ্রসঙ্গে স্বামীজীর উপনিষদে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তাহার পর হইতে যখনই সুযোগ পাইয়াছি, পরম শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদ অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখে উচ্চারিত অপূর্ব্ব সুর লয় ও তাল তেজস্বিতার সহিত পঠিত উপনিষদের এক একটি মন্ত্র যেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই। যখন পরচর্চ্চায় মগ্ন হইয়া আত্মচর্চ্চা ভুলিয়া থাকি, তখন শুনিতে পাই—তাঁহার সেই সুপরিচিত কিন্নরকণ্ঠোচ্চারিত উপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণা—

"তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

—মুণ্ডক, ২।২।৫

—'সেই একমাত্র আত্মাকে জান, অন্য বাক্য সব পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃতের সেতু।'

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হইয়া বিদ্যুল্লতা চমকিতে থাকে, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজী সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিতেছেন,—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥" —কঠোপ, ২।২।১৫

—'সেখানে সূর্য্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-তারাও নহে, এইসব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না—এই সামান্য অগ্নির কথা কি? তিনি প্রকাশিত থাকাতে তাঁহার পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে—তাঁহার প্রকাশে এই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।'

অথবা যখন তত্ত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করিয়া হৃদয় হতাশে আচ্ছন্ন হয়, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজী আনন্দোৎফুল্লমুখে উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেন,—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। —শ্বেতাশ্ব, ২।৫

*　　　　*　　　　*

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥" —শ্বেতাশ্ব, ২।৮

'—হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি সেই মহান পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে—মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।'

যাহা হউক, আর একদিনের ঘটনার বিবরণ এখানে সংক্ষেপে বলিব। এদিনের ঘটনা শরৎ বাবু তাঁহার 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি অদ্য দ্বিপ্রহরেই উপস্থিত হইয়াছি। দেখি ঘরের ভিতর একঘর গুজরাটি পণ্ডিত, তাঁহাদের নিকট স্বামীজী বসিয়া অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক বিচার করিতেছেন। জ্ঞান-ভক্তি-নানাবিষয়িণী কথা হইতেছে। ইতোমধ্যে একটা গোল উঠিল। লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, স্বামীজী সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ কি একটা ব্যাকরণের ভুল করিয়াছেন। তাই পণ্ডিত মহাশয়গণ জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যের চর্চ্চা সব ছাড়িয়া দিয়া ঐ ব্যাকরণের খুঁত ধরিয়া "আমরা স্বামীজীকে হারাইলাম" বলিয়া খুব সোরগোল করিতেছেন ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই কথা মনে পড়িল—"চিল শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ে!" যাহা হউক, স্বামীজী বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "দাসোঽহং পণ্ডিতানাং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম্।" খানিকক্ষণ বাদে স্বামীজী উঠিয়া গেলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়গণ গঙ্গায় হাত মুখ ধুইতে গেলেন। আমিও বাগানে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গাতীরে গিয়াছি, শুনিতে পাইলাম, পণ্ডিতগণ স্বামীজীর সম্বন্ধে কি আলোচনা করিতেছেন। শুনিলাম—তাঁহারা বলিতেছেন, "স্বামীজী তাদৃশ পণ্ডিত নন, তবে উঁহার চক্ষুতে এক মোহিনী

শক্তি আছে, সেই শক্তি-বলেই তিনি নানাস্থানে দিগ্বিজয় লাভ করিয়াছেন।"

ভাবিলাম, পণ্ডিতগণ ত ঠিক ধরিয়াছেন। চক্ষুতে এ মোহিনী শক্তি না থাকিলে কি এত বিদ্বান্, ধনী, মানী, প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য দেশীয় বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারী দাসের ন্যায় ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে? এ ত বিদ্যায় নয়, রূপে নয়, ঐশ্বর্য্যে নয়—এ তাঁহার চক্ষের সেই মোহিনী শক্তিতে।

হে পাঠক, চক্ষে এ মোহিনী শক্তি স্বামীজীর কোথা হইতে আসিল, তাহা জানিবার জন্য যদি কৌতূহল হয়, তবে তাঁহার শ্রীগুরুর সহিত দিব্য সম্বন্ধ এবং অপূর্ব্ব সাধনবৃত্তান্ত একবার শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা কর—ইহার সন্ধান পাইবে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে চার-পাঁচ দিন হইল বাড়ী ছাড়িয়া মঠে রহিয়াছি। পুরাতন সন্ন্যাসি-বর্গের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নির্ম্মলানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ মাত্র আছেন। স্বামীজী দার্জ্জিলিং হইতে আসিয়া পড়িলেন—সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামীজীর মান্দ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, কিডি, জি.জি. প্রভৃতি।

স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েকদিন হইল স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি স্বামীজীকে বলিলেন, "এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।"

স্বামীজী তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ—একটা নিয়ম করা ভাল বই কি। ডাক্ সকলকে।" সকলে আসিয়া

বড় ঘরটিতে জমা হইলেন। তখন স্বামীজী বলিলেন, "একজন কেউ লিখতে থাক্, আমি বলি।" তখন এ উহাকে সামনে ঠেলিয়া দিতে লাগিল—কেউ অগ্রসর হয় না, শেষে আমাকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার উপর সাধারণতঃ একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সাধনভজন করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা—এইটিই সার,—আর লেখাপড়াটা—উহাতে মানযশের ইচ্ছা আসিবে, যাহারা ভগবানের আদিষ্ট হইয়া প্রচার-কার্য্যাদি করিবে, তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইলেও সাধকদের পক্ষে উহার প্রয়োজন ত নাই-ই, বরং উহা হানিকর—এই ধারণাই প্রবল ছিল। যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি কতকটা forward ও বেপরোয়া—আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম। স্বামীজী একবার শূন্তের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি থাক্‌বে?" (অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রহ্মচারিরূপে তথায় থাকিব অথবা দুই-এক দিনের জন্য মঠে বেড়াইতে আসিয়াছি, আবার চলিয়া যাইব?) সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে একজন বলিলেন, "হাঁ।" তখন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলাম। নিয়মগুলি বলিবার পূর্ব্বে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, এইসব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে আমাদের স্বভাবতঃই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে—সু-নিয়মের দ্বারা সেই কু-নিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে, শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।"

তারপর নিয়মগুলি লেখান হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ ধ্যান জ্ঞান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও

অপরাহ্ণে সকলে মিলিয়া একজন পাঠকের নিকট কোন নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থাদি শুনিতে হইবে, এই ব্যবস্থা হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ণে একটু একটু করিয়া ডেলসার্ট ব্যায়াম করিতে হইবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল। মাদকদ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছু চলিবে না—এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হইল। শেষে সমুদয় লেখান শেষ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, "দেখ্, একটু দেখে শুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি করে রাখ্—দেখিস্, যদি কোন নিয়মটা negative (নেতিবাচক) ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে positive (ইতিবাচক) করে দিবি।"

এই শেষোক্ত আদেশ-প্রতিপালনে আমাদিগকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্বামীজীর উপদেশ ছিল, লোককে খারাপ বলা বা তাহার বিরুদ্ধে কু-সমালোচনা করা, তাহার দোষ দেখান, তাহাকে 'তুমি অমুক করো না, তমুক করো না'—এইরূপ negative উপদেশ দিলে তাহার উন্নতির বিশেষ সাহায্য হয় না, কিন্তু তাহাকে যদি একটা আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই তাহার সহজে উন্নতি হইতে পারে, তাহার দোষগুলি আপনা আপনি চলিয়া যায়। ইহাই স্বামীজীর মূল কথা। স্বামীজীর সব নিয়মগুলিকে positive করিয়া লইবার উপদেশে আমাদের মনে বারবার ঐ কথাই উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার আদেশ মত যখন আমরা সব নিয়মগুলির মধ্য হইতে 'না' কথাটির সম্পর্ক রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম আর কোন নিয়মে কোন গোল নাই, কিন্তু মাদকদ্রব্যসম্বন্ধীয় নিয়মটাতেই একটু গোল। সেটি প্রথম এইভাবে লেখা হইয়াছিল যে, 'মঠে তামাক ব্যতীত কেহ অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না।' যখন আমরা উহার মধ্যগত 'না'টিকে বাদ দিবার চেষ্টা করিলাম, তখন প্রথম দাঁড়াইল—

'সকলে তামাক খাইবেন।' কিন্তু ঐরূপ বাক্যের দ্বারা সকলের উপর (যে না খায়, তাহারও উপর) তামাক খাইবার বিধি আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, শেষে অনেক মাথা খাটাইয়া নিয়মটি এইরূপ দাঁড়াইল—'মঠে কেবলমাত্র তামাক সেবন করিতে পারিবেন'—যাহা হউক, এখন মনে হইতেছে আমরা একটা বিকট আপোষ করিয়াছিলাম। Detail-এর ভিতর আসিলে, বিধিনিষেধের মধ্যে নিষেধটাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না, তবে ইহাও সত্য যে, এই বিধিনিষেধগুলি যত মূলভাবের অনুগামী হয়, ততই উহাতে অধিকতর উপযোগিতা দাঁড়ায়। আর স্বামীজীরও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ছিল।

* * *

একদিন অপরাহ্নে বড়-ঘরে একঘর লোক। স্বামীজী তন্মধ্যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে। তন্মধ্যে আমাদের বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ বসু (বর্ত্তমানে আলিপুর আদালতের স্বনামখ্যাত উকিল) মহাশয়ও আছেন। তখন বিজয় বাবু সময়ে সময়ে নানা সভায়—এমন কি, কখন কখন কংগ্রেসে দাঁড়াইয়াও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার এই বক্তৃতাশক্তির কথা কেহ স্বামীজীর নিকট উল্লেখ করিলে স্বামীজী বলিলেন, "তা বেশ বেশ। আচ্ছা, অনেক লোক এখানে সমবেত আছেন—এখানে দাঁড়িয়ে একটু বক্তৃতা কর দেখি। আচ্ছা—soul (আত্মা) সম্বন্ধে তোমার যা idea (ধারণা) তাই খানিকটা বল।" বিজয় বাবু নানা ওজর করিতে লাগিলেন—স্বামীজী এবং আর আর অনেকেও তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অন্ততঃ ১৫ মিনিট অনুরোধ-উপরোধের পরও যখন কেহ তাঁহার সঙ্কোচ ভাঙ্গিতে কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন অগত্যা হার মানিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি বিজয় বাবু

হইতে আমার উপর পড়িল। আমি মঠে যোগ দিবার পূর্ব্বে কখন কখন ধর্ম্মসম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতা করিতাম, আর আমাদের এক ডিবেটিং ক্লাব্‌ ছিল—তাহাতে ইংরেজী বলিবার অভ্যাস করিতাম। আমার সম্বন্ধে এইসকল বিষয় কেহ উল্লেখ করাতেই এবার আমার উপর চোট পড়িল, আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি অনেকটা বেপরোয়া, অথবা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে দুকান-কাটা। Fools rush in where angels fear to tread. আমাকে আর বেশী বলিতে হইল না। আমি একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদান্তর্গত আত্মতত্ত্বের বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা সম্বন্ধে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া যা মুখে আসিল, বলিয়া গেলাম। ভাষা বা ব্যাকরণের ভুল হইতেছে বা ভাবের অসামঞ্জস্য হইতেছে, এসকল খেয়ালই করিলাম না। দয়ার সাগর স্বামীজী আমার এই হঠকারিতায় কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমার পরে স্বামীজীর নিকট নূতন সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ স্বামী[১] প্রায় ১০ মিনিটকাল ধরিয়া আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে বলিলেন। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতার প্রারম্ভের অনুকরণ করিয়া বেশ গম্ভীর স্বরে নিজ বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। তাঁহারও বক্তৃতার স্বামীজী খুব প্রশংসা করিলেন।

আহা! স্বামীজী বাস্তবিকই কাহারও দোষ দেখিতেন না। যাহার যেটুকু সামান্য গুণ বা শক্তি দেখিতেন, তাহাতেই উৎসাহ দিয়া যাহাতে

---

১ ইনি সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো (ইউ. এস. এ.) বেদান্ত-সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন। আমেরিকায় তাঁহার কার্য্যকাল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই কলিকাতায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বেদান্ত-সমিতিতে শরীরত্যাগ করিয়াছেন।

তাহার ভিতরের অব্যক্ত শক্তিগুলি প্রকাশিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পাঠকবর্গ, আপনারা একথা হইতে যেন ইহা ভাবিয়া বসিবেন না যে, তিনি সকলকে সকল কার্য্যেই প্রশ্রয় দিতেন। কারণ, বহুবার দেখিয়াছি, লোকের—বিশেষতঃ অনুগত গুরুভ্রাতা বা শিষ্যগণের দোষ-প্রদর্শনে তিনি সময়ে সময়ে কঠোরমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। কিন্তু সেটি আমাদের দোষসংশোধনের জন্য—আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য—আমাদিগকে নিরুৎসাহ করিবার বা আমাদের মত কেবল পরদোষানুসন্ধান-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। আর এরূপ উৎসাহদাতা, ভরসাদাতা কোথায় পাইব? কোথায় পাইব এমন ব্যক্তি, যিনি শিষ্যবর্গকে লিখিতে পারেন, "I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be. Everyone of you must be a giant—*must*, that is my word."—আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যাহা হইতে পারিতাম, তদপেক্ষা শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেককেই শূরবীর হইতে হইবে—হইতেই হইবে—নহিলে চলিবে না।

* * *

সেই সময়ে স্বামীজীর ইংলণ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগসম্বন্ধীয় বক্তৃতাসমূহ লণ্ডন হইতে ই. টি. ষ্টার্ডি সাহেব কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইতেছে—মঠেও উহার দুই-এক কপি প্রেরিত হইতেছে। স্বামীজী দার্জ্জিলিং হইতে তখনও ফেরেন নাই—আমরা পরম আগ্রহসহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ অদ্বৈততত্ত্বের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরেজী জানেন না—কিন্তু তাঁহার বিশেষ আগ্রহ 'নরেন' বেদান্তসম্বন্ধে বিলাতে কি বলিয়া লোককে

মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা শুনেন। তাঁহার অনুরোধে আমরা তাঁহাকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়িয়া তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, "তোমরা স্বামীজীর এই বক্তৃতাগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ কর না।" তখন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত উক্ত pamphletগুলির মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করিয়া অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ইতোমধ্যে স্বামীজী আসিয়া পড়িয়াছেন। একদিন প্রেমানন্দ স্বামী স্বামীজীকে বলিলেন, "এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করেছে।" পরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামীজীকে শুনাও দেখি।" তখন সকলেই নিজ নিজ অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এই শব্দের এইরূপ অনুবাদ হইলে ভাল হয়, এইরূপ দুই-একটি কথাও বলিলেন। একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই রহিয়াছি, তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন, "রাজযোগটা তর্জ্জমা কর্ না।" আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন করিলেন? আমি তাহার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম, ঐ যোগের উপর কিছুদিন এত অনুরাগ হইয়াছিল যে, ভক্তি জ্ঞান বা কর্ম্মযোগকে একরূপ অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতাম। মনে ভাবিতাম, মঠের সাধুরা যোগযাগ কিছু জানেন না, সেইজন্যই তাঁহারা যোগসাধনে উৎসাহ দেন না। স্বামীজীর রাজযোগ গ্রন্থ পড়িয়া ধারণা হয় যে, স্বামীজী শুধু যে রাজযোগে বিশেষ পটু তাহা নহেন, উক্ত যোগ সম্বন্ধে আমার যেসকল ধারণা ছিল, সে-সকল ত তিনি উত্তমরূপেই বুঝাইয়াছেন, তদ্ব্যতীত ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য যোগের সহিত রাজযোগের সম্বন্ধও

তিনি অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। স্বামীজীর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার ইহা অন্যতম কারণ হইয়াছিল। রাজযোগের অনুবাদ করিলে উক্ত গ্রন্থের উত্তম চর্চ্চা হইবে এবং তাহাতে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চ্চার অভাব দেখিয়া, সর্ব্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? তিনি ৺প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত একখানি পত্রে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা দেশে রাজযোগের চর্চ্চার একান্ত অভাব—যাহা আছে, তাহা দমটানা ইত্যাদি বই আর কিছু নয়।"

যাহা হউক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

* * *

একদিন অপরাহ্ণে একঘর লোক বসিয়া আছে, স্বামীজীর খেয়াল হইল, গীতা পাঠ করিতে হইবে। অমনি গীতা আনা হইল। সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া স্বামীজী গীতা সম্বন্ধে কি বলেন, শুনিতে লাগিলেন। গীতা সম্বন্ধে সেদিন তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা দুই-চারি দিন পরেই স্বামী প্রেমানন্দের আদেশে স্মরণ করিয়া যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। তাহা 'গীতাতত্ত্ব' নামে প্রথমে 'উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'ভারতে বিবেকানন্দে'র অঙ্গীভূত করা হয়। সুতরাং কথাগুলি পুনর্ব্বার লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির ইচ্ছা করি না; কিন্তু এখানে ঐ গীতা-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে স্বামীজীকে যে বিভিন্ন ভাবে ভাবিত দেখিয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। আমরা মহাপুরুষের বাক্যাবলী অনেক সময় যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করি বটে, কিন্তু

যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেইসব বাক্য তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা প্রায় লিপিবদ্ধ থাকে না ; আবার মহাপুরুষের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ না হইলে হাজার বর্ণনা করিলেও লোকে তাঁহাদের ভিতরের জিনিস লইতে পারে না। তথাপি তাঁহাদের সম্বন্ধে যতটা যথাযথ লিপিবদ্ধ থাকে, ততটাই—যাঁহাদের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ হয় নাই, তাঁহাদের বড়ই আদরের বস্তু হয়, এবং তাহার আলোচনায় ও ধ্যানে তাঁহাদের কল্যাণ হয়। হে পাঠকবর্গ, সেই মহাপুরুষের যে ছবি এখনও যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে তাহা তোমাদেরও মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হউক। তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আজ আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সেই মহাপণ্ডিত, মহাতেজস্বী, মহাপ্রেমিকের ছবি জাগিতেছে। তোমরাও একবার আমার সহিত দেশকালের ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদের স্বামীজীকে দেখিবার চেষ্টা কর।

যখন আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি একজন কঠোর সমালোচক—কৃষ্ণার্জ্জুন, ব্যাস, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ-পরম্পরা যখন তন্নতন্নরূপে বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখন সময়ে সময়ে বোধ হইতে লাগিল, এ ব্যক্তির নিকট অতি কঠোর সমালোচকও হার মানিয়া যায়। ঐতিহাসিক তত্ত্বের এইরূপ তীব্র বিশ্লেষণ করিলেন বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ে স্বামীজী নিজ মতামত বিশেষভাবে কিছু প্রকাশ না করিয়াই পরে বুঝাইলেন, ধর্ম্মের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক নাই। ঐতিহাসিক গবেষণায় শাস্ত্রবিবৃত ব্যক্তিগণ কাল্পনিক প্রতিপন্ন হইলেও সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গে তাহাতে একটা আঁচড়ও লাগে না। আচ্ছা, যদি ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক না রহিল, তবে ঐতিহাসিক গবেষণার কি কোন মূল্য নাই?—এই

প্রশ্নের সমাধানে স্বামীজী বুঝাইলেন, নির্ভীকভাবে এইসকল ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। উদ্দেশ্য মহান হইলেও তজ্জন্য মিথ্যা ইতিহাস রচনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বরং যদি লোকে সর্ব্ববিষয়ে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবে সে একদিন সত্যস্বরূপ ভগবানেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। তার পর গীতার মূলতত্ত্বস্বরূপ সর্ব্বমতসমন্বয় ও নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে করিয়া শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" ইত্যাদি অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধার্থ উত্তেজনাবাক্য পড়িয়া তিনি স্বয়ং সর্ব্বসাধারণকে যেভাবে উপদেশ দেন, তাহা তাঁহার মনে পড়িল—"নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে", এ ত তোমার সাজে না—তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি ব্রহ্ম, তোমাতে যে নানারূপ ভাববিকৃতি দেখিতেছি—তাহা ত তোমার সাজে না। প্রফেটের মত ওজস্বিনী ভাষায় এই তত্ত্ব বলিতে বলিতে তাঁহার ভিতর হইতে যেন তেজ বাহির হইতে লাগিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "যখন অপরকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখ্‌তে হবে—তখন মহাপাপীকেও ঘৃণা কর্‌লে চল্‌বে না।" "মহাপাপীকে ঘৃণা করো না" এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখের যে ভাবান্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া আছে—যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখানা যেন ভালবাসায় ডগমগ করিতেছে—তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই।

এই এক শ্লোকের মধ্যেই স্বামীজী সমগ্র গীতার সার নিহিত দেখিয়া শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, "এই একটিমাত্র শ্লোক পড়্‌লেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল হয়।"

* * *

একদিন ব্রহ্মসূত্র আনিতে বলিলেন। বলিলেন, "ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য না পড়ে এখন স্বাধীনভাবে সকলে সূত্রগুলির অর্থ বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্।" প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্রগুলি পড়া হইতে লাগিল। স্বামীজী যথাযথভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন; বলিলেন, "সংস্কৃত ভাষা আমরা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করি না, অথচ এর উচ্চারণ এত সহজ যে, একটু চেষ্টা কর্‌লে সকলেই শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ কর্‌তে পারে। কেবল আমরা ছেলেবেলা থেকে অন্যরূপ উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়েছি—তাই ঐরকম উচ্চারণ এখন আমাদের এত বিসদৃশ ও কঠিন বোধ হয়। আমরা 'আত্মা' শব্দকে 'আত্‌মা' এইরূপ উচ্চারণ না করে 'আত্ত্‌াঁ' এই ভাবে উচ্চারণ করি কেন? মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলেছেন, অপশব্দ-উচ্চারণকারীরা ম্লেচ্ছ—আমরা সকলেই ত পতঞ্জলির মতে ম্লেচ্ছ হয়েছি।" তখন নূতন ব্রহ্মচারিসন্ন্যাসিগণ এক এক করিয়া যথাসাধ্য ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি পড়িতে লাগিলেন। পরে স্বামীজী যাহাতে সূত্রের প্রত্যেক শব্দটি ধরিয়া উহার অক্ষরার্থ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সূত্রগুলি যে কেবল অদ্বৈতমতেরই পোষক, একথা কে বললে? শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন—তিনি সকল সূত্রগুলিকে কেবল অদ্বৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোরা সূত্রের অক্ষরার্থ কর্‌বার চেষ্টা করবি—ব্যাসের যথার্থ অভিপ্রায় কি, বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌বি—উদাহরণস্বরূপ দেখ্‌—'অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি'[১]—এই সূত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয় বাদই ভগবান্ বেদব্যাস কর্তৃক সূচিত হয়েছে।"

১ ব্রহ্মসূত্র—১।১।১৯

স্বামীজী একদিকে যেমন গম্ভীরাত্মা ছিলেন, তেমনি অপরদিকে সুরসিকও ছিলেন। পড়িতে পড়িতে "কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা"[1] সূত্রটি আসিল। স্বামীজী এই সূত্রটি পাইয়াই স্বামী প্রেমানন্দের নিকট ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সূত্রটির প্রকৃত অর্থ এই—যথন উপনিষদে জগৎকারণের প্রসঙ্গ উঠাইয়া 'সোঽকাময়ত'—তিনি (অর্থাৎ সেই জগৎ-কারণ) কামনা করিলেন, এইরূপ কথা আছে, তথন 'অনুমানগম্য' (অচেতন) প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎকারণরূপে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা শাস্ত্রগ্রন্থের নিজ নিজ অদ্ভুত রুচি অনুযায়ী কদর্থ করিয়া এমন পবিত্র সনাতন ধর্ম্মকে ঘোর বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, গ্রন্থকারের যাহা কোন কালে অভিপ্রেত ছিল না, তিনি যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এমন সকল বিষয় গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বস্তুরূপে প্রতিপন্ন করিয়া ধর্ম্ম জিনিসটাকে শিষ্টজনের "দূরাৎ পরিহর্ত্তব্য" পদার্থ করিয়া তুলিয়াছে, স্বামীজী কি তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিলেন? অথবা যেমন তিনি অন্যান্য অনেক সময় বলিয়াছিলেন যে, কঠিন শুষ্ক গ্রন্থ আয়ত্ত করাইবার জন্য তিনি তন্মধ্যে সাধারণ মনের উপযোগী রসিকতা প্রবেশ করাইয়া অপরকে সহজেই তাহা আয়ত্ত করাইয়া দিতেন, সেই চেষ্টা করিতেছিলেন?

যাহা হউক, পাঠ চলিতে লাগিল। ক্রমে "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ"[2] সূত্র আসিল। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী প্রেমানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, তোর ঠাকুরও যে নিজেকে ভগবান্ বলতেন, সে ঐ ভাবে বল্‌তেন।" এই কথা বলিয়াই কিন্তু স্বামীজী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর

১ ব্রহ্মসূত্র—১।১।১৮
২ ঐ —১।১।৩০

নাভিশ্বাসের সময় বলেছিলেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।' " এই বলিয়া আবার অন্য সূত্র পড়িতে বলিলেন।

এখানে ঐ সূত্রটি সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কৌষীতকী উপনিষদে ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদ নামক একটি আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, প্রতর্দ্দন নামক জনৈক রাজা দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করাতে ইন্দ্র তাঁহাকে বর দিতে চান। প্রতর্দ্দন তাহাতে এই বর প্রার্থনা করেন যে, আপনি যাহা মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর মনে করেন, তাহাই বর দিন। তাহাতে ইন্দ্র তাঁহাকে এই উপদেশ দেন, "মাং বিজানীহি"—আমায় জান। এক্ষণে সূত্রকার ঐ 'আমাকে' অর্থে ইন্দ্র কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এই প্রশ্ন উঠাইয়াছেন। সমুদয় আখ্যায়িকাটি অধ্যয়ন করিলে প্রথমেই কতকগুলি সন্দেহ হয়—'আমাকে' বলিতে স্থানে স্থানে বোধ হয় যেন ইন্দ্র দেবতাকে বুঝাইতেছে, স্থানে স্থানে আবার প্রাণকে বুঝাইতেছে, কোথাও বা জীবকে বুঝাইতেছে, কোথাও বা আবার ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে—এইরূপ বোধ হয়। এক্ষণে নানাপ্রকার বিচারের দ্বারা সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ঐ স্থলে 'আমাকে' অর্থ ব্রহ্মকে। 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সূত্রকার এমন একটি উদাহরণ দেখাইতেছেন, যাহার সঙ্গে ইন্দ্রের এইরূপ ভাবে উপদেশ সঙ্গত হয়। উপনিষদের স্থলবিশেষে আছে, বামদেব ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি মনু, আমি সূর্য্য হইয়াছি।' ইন্দ্রও এইরূপে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমাকে জান' এখানে 'আমি' ও 'ব্রহ্ম' এক কথা।

স্বামীজীও স্বামী প্রেমানন্দকে বলিতেছেন,—"পরমহংসদেব যে কখন কখন নিজেকে ভগবান্ বলে নির্দ্দেশ করতেন, তা ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা

হতেই কর্‌তেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সিদ্ধপুরুষমাত্র, অবতার নন্।" এই কথা বলিয়াই কিন্তু জনান্তিকে বলিলেন, "রামকৃষ্ণ স্বয়ং নিজের সম্বন্ধে বল্‌তেন, 'আমি শুধু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নই, আমি অবতার।'" সুতরাং আমাদের একটি বন্ধু যেমন বলিতেন, রামকৃষ্ণকে শুধু একজন সাধু বা সিদ্ধ-পুরুষ বলিতে পারা যায় না, যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানিতে হয়, নতুবা প্রতারক বলিতে হয়।

যাহা হউক, স্বামীজীর কথায় আমার একটা বিশেষ উপকার হইল। সামান্য ইংরেজী পড়িয়া আর কিছু হউক না হউক, সন্দেহ করিতে বিশেষ শিখিয়াছিলাম। মহাপুরুষগণের শিষ্যগণ তাঁহাদের গুরুকে বাড়াইতে যাইয়া নানারূপ কল্পনা ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় করে, ইহাই অন্তরে অন্তরে সংস্কার ছিল। অদ্ভুত sincerity, সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তিনি যে কোনরূপে অতিরঞ্জন করিতে পারেন, এ ধারণা একেবারে দূর হইয়াছিল। স্বামীজীর বাক্য ধ্রুব সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার বাক্যে পরমহংসদেব সম্বন্ধে এক নূতন আলোক পাইলাম। যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ—এই কথা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, এখন এই কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। স্বামীজীর অপার দয়া, তিনি আমাদিগকে সন্দেহ ত্যাগ করিতে বলেন নাই, ফস্ করিয়া কাহারও কথা বিশ্বাস করিতে বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণচরিত্র তোমার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যতদূর সাধ্য আলোচনা কর, অধ্যয়ন কর—আমি ত তাঁহার লক্ষাংশের একাংশও এখনও বুঝ্‌তে পারি নি—ও যত বুঝ্‌বার চেষ্টা করবে, ততই সুখ পাবে, ততই মজ্‌বে।"

* * *

স্বামীজী একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুর-ঘরে লইয়া গিয়া সাধনভজন

শিখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "প্রথম সকলে আসন করে বস্; ভাব্,—আমার আসন দৃঢ় হোক্, এই আসন অচল অটল হোক্, এর সাহায্যেই আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হব।" সকলে বসিয়া কয়েক মিনিট এইরূপ চিন্তা করিলে তারপর বলিলেন, "ভাব্—আমার শরীর নীরোগ ও সুস্থ—বজ্রের মত দৃঢ়—এই দেহ-সহায়ে আমি সংসারের পারে যাব।" এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবিতে বলিলেন, "এইরূপ ভাব্ যে, আমার নিকট হতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চতুর্দ্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে—হৃদয়ের ভিতর হতে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হচ্ছে—সকলের কল্যাণ হোক্, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক্। এইরূপ ভাবনার পর কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করবি, অধিক নয়, তিনটি প্রাণায়াম করলেই হবে। তারপর হৃদয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্টমূর্ত্তির চিন্তা ও মন্ত্রজপ—এইটি আধ ঘণ্টা আন্দাজ করবি।" সকলেই স্বামীজীর উপদেশ মত চিন্তাদির চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে সমবেত সাধনানুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামীজীর আদেশে নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া বহুকাল যাবৎ, "এইবার এইরূপ চিন্তা কর, তারপর এইরূপ কর" বলিয়া—বলিয়া দিয়া এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া স্বামীজীপ্রোক্ত সাধন-প্রণালী অভ্যাস করাইয়াছিলেন।

* * *

একদিন সকালবেলা, ৯টা ১০টার সময় আমি একটা ঘরে বসিয়া কি করিতেছি—হঠাৎ তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্ম্মলানন্দ) আসিয়া বলিলেন, "স্বামীজীর নিকট দীক্ষা নেবে?" আমিও বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ।" ইতঃপূর্ব্বে আমি কুলগুরু বা অপর কাহারও নিকট কোন প্রকার মন্ত্র গ্রহণ করি নাই। জনৈক যোগীর নিকট প্রাণায়ামাদি কয়েকটি যোগের ক্রিয়া

লইয়া প্রায় তিন বৎসর সাধন এবং তাহাতে কতকটা শারীরিক উন্নতি ও মনের স্থৈর্য্য লাভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট গৃহস্থাশ্রম-অবলম্বনের অত্যাবশ্যকতা, এবং প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া ব্যতীত জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি অন্যান্য পথগুলি একেবারে বৃথা—এইরূপ গোঁড়ামি আমার আদৌ ভাল লাগিত না। অপরদিকে মঠের অন্য কোন কোন সন্ন্যাসী বা তাহাদের অনুগত ভক্তগণ যোগের নাম শুনিলেই উড়াইয়া দিতেন ও উহাতে বিশেষ কিছু হয় না, পরমহংসদেব উহার তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না, ইত্যাদি কথা তাঁহাদের নিকট শুনিতে পাইতাম। স্বামীজীর রাজযোগ পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম, এই গ্রন্থের প্রণেতা যেমন যোগমার্গের সমর্থক, তদ্রূপ অন্যান্য মার্গের প্রতিও শ্রদ্ধাসম্পন্ন, গোঁড়া ত নহেনই, বরং এরূপ উদার ভাবের আচার্য্য আমার নয়নপথে কখন পতিত হন নাই—তাহাতে আবার সন্ন্যাসী—সুতরাং তাঁহার প্রতি যে আমার হৃদয়ের বিশেষ শ্রদ্ধা হইবে, তাহাতে আশ্চয্য কি? পরে বিশেষরূপে জানিয়াছি যে, পরমহংসদেব সাধারণতঃ প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়ার উপদেশ করিতেন না। তিনি জপ ও ধ্যানেরই বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, বলিতেন—"ধ্যানাবস্থা প্রগাঢ় হলে বা ভক্তির প্রাবল্যে প্রাণায়াম আপনা আপনি হয়ে যায়, এসকল দৈহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অনেক সময় দেহের দিকে মন এসে পড়ে।" —কিন্তু অন্তরঙ্গ শিষ্যগণকে যোগের উচ্চাঙ্গের সাধনা করাইতেন, তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহাদিগের কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিতেন এবং ষট্‌চক্রের বিভিন্ন চক্রে মনঃস্থৈর্য্যের সুবিধার জন্য সময়ে সময়ে দেহের স্থানবিশেষে আল্‌পিন ফুটাইয়া তথায় মনঃস্থির করিতে বলিতেন। স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণের অনেককে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার যে উপদেশ দিয়াছিলেন,

তাহা আমার বোধ হয়, স্বামীজীর স্বকপোল-কল্পিত নহে, উহা তাঁহার গুরূপদিষ্ট মার্গ। আর একটি কথা স্বামীজী বলিতেন যে, কাহাকেও যথার্থ সৎমার্গে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, তাহারই ভাবায় তাহাকে উপদেশ করিতে হইবে। এই ভাব অনুসরণ করিয়াই তিনি ব্যক্তিবিশেষকে বা অধিকারি-বিশেষকে বিশেষ বিশেষ সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিতেন এবং সর্ব্ববিধ প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকেই অল্প-বিস্তর আধ্যাত্মিক সাহায্য করিতে কৃতকার্য্য হইতেন।

যাহা হউক, আমি এতদিন তাঁহার উপদেশ শুনিতেছি, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক সাহায্য কিছু পাই নাই, পাইবার চেষ্টাও করি নাই। চেষ্টা করি নাই, তাহার কারণ—বলিতে ভরসা হয় নাই—আরও মনে মনে একটা ভাব ছিল বোধ হয় যে, যখন ইঁহার আশ্রিত হইলাম, তখন যাহা প্রয়োজন সবই পাইব। কিভাবে আধ্যাত্মিক সাহায্য করিবেন, তাহাও জানা ছিল না। এক্ষণে নির্ম্মলানন্দ স্বামীর এইরূপ অযাচিত আহ্বানে প্রাণে আর দ্বিধা রহিল না। 'লইব' বলিয়াই তাঁহার সঙ্গে ঠাকুর-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। জানিতাম না যে, সেদিন শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দীক্ষা লইতেছেন—তখনও দীক্ষাদান শেষ হয় নাই বলিয়া, বোধ হয় ঠাকুর-ঘরের বাহিরে একটু অপেক্ষাও করিতে হইয়াছিল। তার পর শরৎ বাবু বাহির হইয়া আসিবামাত্র তুলসী মহারাজ আমাকে লইয়া গিয়া স্বামীজীকে বলিলেন, "এ দীক্ষা নেবে।" স্বামীজী আমাকে বসিতে বলিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সাকার ভাল লাগে, না, নিরাকার ভাল লাগে?"

আমি বলিলাম, "কখন সাকার ভাল লাগে, কখন বা নিরাকার ভাল লাগে।"

তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন, "তা নয়; গুরু বুঝতে পারেন, কার কি পথ; হাতটা দেখি।" এই বলিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অল্পক্ষণ যেন ধ্যান করিতে লাগিলেন। তার পর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তুই কখন ঘটস্থাপনা করে পূজো করেছিস্?" আমি বাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে ঘটস্থাপনা করিয়া কোন পূজা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলাম—তাহা বলিলাম। তিনি তখন একটি দেবতার মন্ত্র বলিয়া দিয়া উহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন ও বলিলেন, "এই মন্ত্রে তোর সুবিধে হবে। আর ঘটস্থাপনা করে পূজো করলে তোর সুবিধে হবে।" তৎপরে আমার সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া পরে সম্মুখে কয়েকটি লিচু পড়িয়াছিল—সেইগুলি লইয়া আমায় গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিতে বলিলেন।

আমি দেখিলাম, যদি আমাকে ভগবচ্ছক্তিস্বরূপ কোন দেবতার উপাসনা করিতে হয়, তবে স্বামীজী যে দেবতার কথা আমায় উপদেশ দিলেন, তাহাই আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিসঙ্গত। শুনিয়াছিলাম, যথার্থ গুরুরা শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিয়া মন্ত্র দেন, স্বামীজীতে আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

দীক্ষাগ্রহণের কিছু পরে স্বামীজীর আহার হইল। স্বামীজীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ আমি ও শরৎ বাবু উভয়েই ধারণ করিলাম।

মঠে তখন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরার' নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হইত, কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীদের এরূপ সংস্থান ছিল না যে, উহার ডাকখরচটা দেন। উক্ত পত্র পিয়ন দ্বারা বরাহনগর পর্য্যন্ত বিলি হইত। বরাহনগরে 'দেবালয়ের' প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত একটি বিধবাশ্রম ছিল। তথায় একখানি করিয়া ঐ আশ্রমের জন্য উক্ত পত্র আসিত। 'ইণ্ডিয়ান

মিরারে'র পিয়নের ঐ পর্য্যন্ত 'বিট' বলিয়া মঠের কাগজখানিও ঐখানে আসিত এবং তথা হইতে উহা প্রত্যহ মঠে লইয়া আসিতে হইত। উক্ত বিধবাশ্রমের উপর স্বামীজীর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহার আমেরিকায় অবস্থানকালে এই আশ্রমের সাহায্যের জন্য স্বামীজী একটি benefit বক্তৃতা দেন এবং উক্ত বক্তৃতার টিকিট বেচিয়া যাহা কিছু আয় হয়, তাহা এই আশ্রমেই প্রদত্ত হয়। যাহা হউক, তখন মঠের বাজার করা, ঠাকুর-সেবার আয়োজন প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই কানাই মহারাজ বা স্বামী নির্ভয়ানন্দকে করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এই 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজ আনার ভারও তাঁহার উপরেই ছিল। তখন আমরা মঠে অনেকগুলি নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী জুটিয়াছি, কিন্তু তখনও মঠের প্রয়োজনীয় সমুদয় কর্ম্মের একটা প্রণালীপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া সকলের উপর অল্পাধিক পরিমাণে কাজের ভার দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে যথেষ্ট কার্য্য করিতে হইতেছে। তাঁহারও তাই মনে হইয়াছে যে, তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলির ভিতর কিছু কিছু যদি নূতন সাধুদের উপর দিতে পারেন, তবে তাঁহার কতকটা অবকাশ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে বলিলেন, "যেখানে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' আসে, তোমাকে সেস্থান দেখিয়ে আন্‌বো—তুমি রোজ গিয়ে কাগজখানি এনো।" আমিও ইহা অতি সহজ কাজ জানিয়া এবং উহাতে একজনের কার্য্যভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে ভাবিয়া, সহজেই স্বীকৃত হইলাম। একদিন দ্বিপ্রহরের প্রসাদধারণান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর নির্ভয়ানন্দ আমাকে বলিলেন, "চল, সেই বিধবাশ্রমটি তোমায় দেখিয়ে দিই।" আমিও তাঁহার সহিত যাইতে উদ্যত হইয়াছি, ইতোমধ্যে স্বামীজী দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "বেদান্তপাঠ করা যাক্—আয়।" আমি—অমুক কার্য্যে যাইতেছি—বলায়

আর কিছু বলিলেন না। আমি কানাই মহারাজের সহিত বাহির হইয়া সেইস্থান চিনিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মঠে আমাদের জনৈক ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকট শুনিলাম, আমি চলিয়া যাইবার কিছু পরে স্বামীজী অপরের নিকট বলিতেছিলেন, "ছোড়াটা গেল কোথায়? স্ত্রীলোক দেখ্‌তে গেল নাকি?" এই কথা শুনিয়াই আমি কানাই মহারাজকে বলিলাম, "ভাই, চিনে এলুম বটে, কিন্তু কাগজ আন্‌তে সেখানে আমার আর যাওয়া হবে না।"

শিষ্যগণের, বিশেষতঃ নূতন নূতন ব্রহ্মচারিগণের যাহাতে চরিত্র রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে স্বামীজী এত সাবধান ছিলেন। কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মঠের কোন সাধু-ব্রহ্মচারী বাস করে বা রাত কাটায়—ইহা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না, বিশেষ যেখানে স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার শত শত উদাহরণ দেখিয়াছি।

যেদিন মঠ হইতে রওনা হইয়া আলমোড়া যাত্রার জন্য কলিকাতা যাইবেন, সেদিন সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত নূতন ব্রহ্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যসম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার কানে যেন এখনও বাজিতেছে—

"দেখ্‌, বাবা, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্ম্মজীবন লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্য্যই তার একমাত্র সহায়। তোরা স্ত্রীলোকের একদম সংস্পর্শে আস্‌বি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না করতে বল্‌ছি না, তারা সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা, কিন্তু নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তাদের কাছ থেকে তোদের তফাৎ থাকতে বল্‌ছি। তোরা যে আমার লেক্‌চারে পড়েছিস্—আমি সংসারে থেকেও ধর্ম্ম হয় অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিস্ নি যে, আমার মতে ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস ধর্ম্মজীবনের জন্য অত্যাবশ্যক

নয়। কি কর্‌বো, সে-সব লেক্‌চারের শ্রোতৃমণ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী—তাদের কাছে যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের কথা একেবারে বলি, তবে তার পরদিন থেকে আর কেউ আমার লেক্‌চারে আস্‌তো না। তাদের মতে কতকটা সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের দিকে ঝোঁক হয়, সেইজন্যই ঐ ভাবে লেক্‌চার দিয়েছি। কিন্তু আমার ভিতরের কথা তোদের বল্‌ছি—ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া এতটুকুও ধর্ম্মলাভ হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন কর্‌বি।"

*　　　　*　　　　*

একদিন বিলাত হইতে কি একখানা চিঠি আসিয়াছে, সেই চিঠিখানি পড়িয়া তৎপ্রসঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারকের কি কি গুণ থাকিলে সে কৃতকার্য্য হইতে পারে, বলিতে লাগিলেন। নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ধর্ম্মপ্রচারকের এই এই গুলি খোলা থাকা আবশ্যক, ও এই এই গুলি বন্ধ থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ তাহার মাথা, হৃদয় ও মুখ খোলা থাকা আবশ্যক,—তাহার প্রবল মেধাবী, হৃদয়বান্‌ ও বাগ্মী হওয়া উচিত, আর তাহার অধোদেশের কার্য্য যেন বন্ধ থাকে, যেন সে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যবান্‌ হয়। জনৈক প্রচারককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহার অন্যান্য সমুদয় গুণ আছে, কেবল একটু হৃদয়ের অভাব—যাহা হউক, ক্রমে হৃদয়ও খুলিয়া যাইবে।

সেই পত্রে সিষ্টার নিবেদিতা (তখন মিস্‌ নোব্‌ল্‌) বিলাত হইতে শীঘ্র ভারতে রওনা হইবেন, এই সংবাদ ছিল। মিস্‌ নোব্‌লের প্রশংসায় স্বামীজী শতমুখ হইলেন, বলিলেন, "বিলেতের ভিতর এমন পূতচরিত্রা, মহানুভবা রমণী খুব কম। আমি যদি কাল মরে যাই, এ আমার কাজ বজায় রাখ্‌বে।" স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

*　　　　*　　　　*

বেদান্তের শ্রীভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদক, স্বামীজীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রের প্রধান লেখক, মাদ্রাজের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুত রঙ্গাচার্য্য তীর্থভ্রমণোপলক্ষে শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন, স্বামীজীর নিকট পত্র আসিয়াছে। স্বামীজী মধ্যাহ্নে আমাকে বলিলেন, "চিঠির কাগজ কলম এনে লেখ্ দিকি ; আর একটু খাবার জল নিয়ে আয়।" আমি এক গ্লাস জল স্বামীজীকে দিয়া ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলিলাম, "আমার হাতের লেখা তত ভাল নয়।" আমি মনে করিয়াছিলাম, বিলাত আমেরিকার কোন চিঠি লিখিতে হইবে। স্বামীজী অভয় দিয়া বলিলেন, "লেখ্, foreign letter (বিলাতী চিঠি) নয়।" তখন আমি কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিলাম। স্বামীজী ইংরেজীতে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমি লিখিতে লাগিলাম। অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্যকে একখানি লেখাইলেন ; আর একখানি পত্রও লেখাইয়াছিলেন, কাহাকে—ঠিক মনে নাই। মনে আছে রঙ্গাচার্য্যকে অন্যান্য কথার ভিতর এই কথা লেখাইয়াছিলেন—বাঙ্গালা দেশে বেদান্তের তেমন চর্চ্চা নাই, অতএব আপনি যখন কলিকাতায় আসিতেছেন, তখন "give a rub to the people of Calcutta"—কলিকাতাবাসীকে একটু উস্‌কাইয়া দিয়া যান। কলিকাতায় যাহাতে বেদান্তের চর্চ্চা বাড়ে, কলিকাতাবাসী যাহাতে একটু সচেতন হয়, তজ্জন্য স্বামীজীর কি দৃষ্টি ছিল! নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে চিকিৎসকগণের নির্ব্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী কলিকাতায় দুইটি মাত্র বক্তৃতা দিয়াই স্বয়ং বক্তৃতাদানে বিরত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি যখনই সুবিধা পাইতেন তখনই কলিকাতাবাসীর ধর্ম্মভাব জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেন। স্বামীজীর এই পত্রের ফলেই, ইহার কিছুকাল পরে

কলিকাতাবাসিগণ ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে উক্ত পণ্ডিতবরের 'The Priest and the Prophet' (পুরোহিত ও ঋষি) নামক সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

* * *

একটি বয়স্ক বাঙ্গালী যুবক এই সময় মঠে আসিয়া তথায় সাধুরূপে বাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। স্বামীজী ও মঠের অন্যান্য সাধুবর্গ তাহার চরিত্র পূর্ব্ব হইতেই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাহাকে আশ্রমভুক্ত হইবার অনুপযুক্ত জানিয়া কেহই তাহাকে মঠভুক্ত করিতে সম্মত ছিলেন না। তাহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, "মঠে যে-সকল সাধু আছেন, তাঁদের সকলের যদি মত হয়, তবে তোমায় রাখতে পারি।" এই কথা বলিয়া পুরাতন সাধুবর্গকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একে মঠে রাখতে তোমাদের কার কিরূপ মত?" তখন সকলেই একবাক্যে তাহাকে রাখিতে অমত প্রকাশ করিলে, উক্ত যুবককে আর মঠে রাখা হইল না। ইহার কিছুকাল পরে শুনিয়াছিলাম, এই ব্যক্তি কোনরূপে বিলাত গিয়াছিল এবং সঙ্গে পয়সা কড়ি না থাকাতে তাহাকে work-houseএ থাকিতে হইয়াছিল।

* * *

একদিন অপরাহ্ণে স্বামীজী মঠের বারান্দায় আমাদিগের সকলকে লইয়া বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছেন—সন্ধ্যা হয় হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে স্বামীজী কর্তৃক প্রচার-কার্য্যের জন্য মান্দ্রাজে প্রেরিত হওয়ায় তাঁহার অপর একজন গুরুভ্রাতা তখন মঠে পূজা আরাত্রিকাদি কার্য্যভার লইয়াছেন। আরাত্রিকাদি কার্য্যে যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, তাঁহাদিগকেও লইয়া স্বামীজী বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছিলেন।

হঠাৎ উক্ত গুরুভ্রাতা আসিয়া নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, "চল হে চল, আরতি করতে হবে, চল।" তখন একদিকে স্বামীজীর আদেশে সকলে বেদান্তপাঠে নিযুক্ত, অপর দিকে ইঁহার আদেশে 'ঠাকুরের আরাত্রিকে যোগদান করিতে হইবে—নূতন সাধুরা একটু গোলে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন স্বামীজী তাঁহার ঐ গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একখানা ছবির সাম্‌নে সল্‌তে-পোড়া নাড়্‌লে আর ঝাঁজ পিট্‌লেই মনে করছিস্ বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়? তোরা অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি—"এইরূপ বলিতে বলিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে উক্তরূপে বেদান্তপাঠে ব্যাঘাত দেওয়াতে আরও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফলে বেদান্তপাঠ বন্ধ হইয়া গেল—কিছুক্ষণ পরে আরতিও শেষ হইল। আরতির পরে কিন্তু উক্ত গুরু-ভ্রাতাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না, তখন স্বামীজীও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া "সে কোথায় গেল, সে কি আমার গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গেল?"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সকলকেই চতুর্দ্দিকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহাকে মঠের উপরের ছাদে চিন্তান্বিত ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া স্বামীজীর নিকট লইয়া আসা হইল। তখন স্বামীজীর ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহাকে কত যত্ন করিলেন, তাঁহাকে কত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন! আমরা স্বামীজীর গুরুভাই-এর প্রতি অপূর্ব্ব ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বুঝিলাম, গুরুভাইগণের উপর স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। কেবল যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া উদারতর হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। পরে স্বামীজীর মুখে অনেকবার

শুনিয়াছি, যাঁহাকে স্বামীজী বেশী গালাগাল দিতেন, তিনিই তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র।

*　　　*　　　*

একদিন বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ্, মঠের একটা ডায়েরি রাখ্‌বি, আর হপ্তায় হপ্তায় মঠের একটা করে রিপোর্ট পাঠাবি।" স্বামীজীর এই আদেশ আমি ও পরে মধ্যে মধ্যে অপর অনেকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখনও মঠের সেই আংশিক ডায়েরি মঠে পরিরক্ষিত আছে। তাহা হইতে এখনও মঠের ক্রমবিকাশের অনেকটা ধারাবাহিক ইতিহাস ও স্বামীজী-সম্বন্ধীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

স্বামীজীর স্মৃতি

(১)

স্বামীজীর বাড়ীর কাছেই আমাদের বাড়ী ছিল। এক পাড়ার ছেলে আমরা ছেলেবেলা লেংটা হয়ে তাঁর সঙ্গে কত খেলাই না খেলেছি! তার পর তাঁর জীবন আর আমাদের জীবন কত তফাৎ হয়ে গেল। কত দিন কত বৎসর দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। শুনতে পেতুম বটে তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন, দেশবিদেশে ঘুরছেন। আমার কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তাঁর উপর বিশেষ একটা টান ছিল। তাই বড় হয়েও তাঁর কথা একদিনও ভুলতে পারি নি। তিনি যে একটা খুব বড় লোক হবেন, এটা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে এমন ভাবে যে জগতের পূজ্য হবেন, এ কথা কে ভেবেছিল বল? তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াতে এই কথাই মনে হয়েছিল—হায়, এত বড় শক্তিমান্ পুরুষের জীবনটা মিছেই হয়ে গেল!

তার পর তিনি আমেরিকায় গেলেন। চিকাগোর ধর্ম্মসভার ও আমেরিকার অন্যান্য স্থানের বক্তৃতার সারাংশ একটু-আধটু কাগজে দেখতে লাগলুম। যা একটু-আধটু বিবরণ পেতুম, তাতেই অবাক হয়ে যেতুম। ভাবলুম, আগুন কথনও কাপড়ে ঢাকা থাকে না। এতদিনে স্বামীজীর ভিতরের সেই শক্তি জ্বলে উঠেছে। ছেলেবেলাকার সেই ফুল এতদিনে ফুটেছে। যতই তাঁর অদ্ভুত কথা কাগজে পড়তে লাগলুম, ততই সেই বাল্যবন্ধুকে আবার দেখবার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগলো।

একদিন শুনলুম, তিনি দেশে ফিরেছেন। মান্দ্রাজে এসে জলন্ত অগ্নিময় বক্তৃতা করেছেন। সে বক্তৃতা পড়ে প্রাণ মেতে উঠলো। ভাবলুম হিন্দুধর্ম্মের ভিতর এই জিনিস আছে?—আর এমন সহজ করে জলের মত ধর্ম্মটা বোঝান যায়? এঁর কি অদ্ভুত শক্তি! ইনি কি মানুষ—না দেবতা?

তার পর একদিন কলকেতায় ভারি হৈ চৈ; স্বামীজী এলেন। বাগবাজারে পশুপতি বাবুর বাড়ীতে তাঁর অভ্যর্থনা হলো এবং শীল বাবুদের কাশীপুরের গঙ্গার ধারের বাগানে তাঁকে সঙ্গে করে রেখে আসা গেল। কয়েকদিন পরে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে বিরাট সভায় স্বামীজীর স্নিগ্ধ-গম্ভীর বক্তৃতা হলো—যে যেখান থেকে শুনলে, চিত্রাপিত হয়ে রইল। সে-সব দিনের কথা সকলেরই মনে আছে। লেখবার আবশ্যক নেই।

কলকেতায় আসা অবধি তাঁর সঙ্গে নির্জ্জনে একবার দেখা করবার এবং প্রাণ খুলে ছেলেবেলাকার মত দুটো কথা বলবার জন্যে মন বড় ব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু সর্ব্বদাই লোকের ভিড়। অনবরত বহুলোকের সঙ্গে আলাপ চলেছে। সুবিধামত সময় আর পাই নে। ইতোমধ্যে একটু অবসর পেয়েই তাঁকে ধরে নিয়ে বাগানে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এলুম। তিনিও শৈশবের খেলুড়েকে পেয়ে আগেকার মতই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলেন। দু-চারটা কথা বলতে না বলতেই ডাকের উপর ডাক এলো যে, অনেক নূতন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "বাবা একটু রেহাই দাও; এই ছেলেবেলাকার খেলুড়ের সঙ্গে দুটো কথা কই, একটু ফাঁকা হাওয়ায় থাকি। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের যত্ন করে বসাওগে, তামাক-টামাক খাওয়াওগে।"

যে ডাকতে এসেছিল, সে চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলুম, "স্বামীজী,

তুমি সাধু। তোমার অভ্যর্থনার জন্যে যে টাকা আমরা চাঁদা করে তুললুম, আমি ভেবেছিলুম তুমি দেশের দুর্ভিক্ষের কথা শুনে কলকেতায় পৌঁছুবার আগেই আমাদের তার করবে—'আমার অভ্যর্থনায় এক পয়সা খরচ না করে দুর্ভিক্ষনিবারণী ফণ্ডে ঐ সমস্ত টাকা চাঁদা দাও'; কিন্তু দেখলুম, তুমি তা করলে না; এর কারণ কি?"

স্বামীজী বললেন, "হাঁ, আমি ইচ্ছেই করেছিলুম যে, আমায় নিয়ে একটা খুব হৈ চৈ হয়। কি জানিস্? একটা হৈ চৈ না হলে তাঁর (ভগবান্ রামকৃষ্ণের) নামে লোক চেত্‌বে কি করে? এত ovation কি আমার জন্যে করা হলো, না তাঁর নামেরই জয়জয়কার হলো? তাঁর বিষয় জানবার জন্যে লোকের মনে কতটা ইচ্ছে হলো। এইবার ক্রমে তাঁকে জান্‌বে, তবে না দেশের মঙ্গল হবে। যিনি দেশের মঙ্গলের জন্যে এসেছেন, তাঁকে না জান্‌লে লোকের মঙ্গল কি করে হবে? তাঁকে ঠিক ঠিক জান্‌লে তবে মানুষ তৈরী হবে, আর মানুষ তৈরী হলে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাড়ান কতক্ষণের কথা! আমাকে নিয়ে এই রকম বিরাট সভা করে হৈ চৈ করে তাঁকে প্রথমে মানুক—আমার এই ইচ্ছেই হয়েছিল; নতুবা আমার নিজের জন্যে এত হাঙ্গামের কি দরকার ছিল? তোদের বাড়ী গিয়ে যে একসঙ্গে খেল্‌তুম, তার চেয়ে আর আমি কি বড়লোক হয়েছি? আমি তখনও যা ছিলুম, এখনও তাই আছি। তুই-ই বল্‌না, আমার কোন পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছিস?"

আমি মুখে বল্‌লুম, "না, সে রকম ত কিছুই দেখ্‌ছি নি।" তবে মনে হল—সাক্ষাৎ দেবতা হয়েছে।

স্বামীজী বল্‌তে লাগলেন, "দুর্ভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্য কোন দেশে দুর্ভিক্ষের এত উৎপাত

আছে কি ? নেই, কারণ সে-সব দেশে মানুষ আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ করতে শিখুক, তখন দুর্ভিক্ষ-নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আসবে। ক্রমে সে চেষ্টাও করবো, দেখ্ না।"

আমি। আচ্ছা, তুমি এখানে খুব লেক্‌চার-টেক্‌চার দেবে তো ? তা না হলে তাঁর নাম কেমন করে প্রচার হবে ?

স্বামীজী। তুই খেপেছিস্, তাঁর নাম প্রচারের কি কিছু বাকি আছে ? লেক্‌চার করে এদেশে কিছু হবে না। বাবু ভায়ারা শুনবে, বেশ বেশ করবে, হাততালি দেবে ; তারপর বাড়ী গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম করে ফেলবে। পচা পুরান লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে ? ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে ; তাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে ; তবে হাতুড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন করতে পারা যাবে। এদেশে জলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখালে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের life আগে তয়ের করে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।

আমি। আচ্ছা, স্বামীজী, তোমার নিজের দেশের লোক নিজেদের ধর্ম্ম বুঝতে না পেরে কেউ কৃশ্চান, কেউ মুসলমান, কেউ বা অন্য কিছু হচ্ছে। তাদের জন্যে তুমি কিছু না করে, গেলে কি-না আমেরিকা ইংলণ্ডে ধর্ম্ম বিলুতে ?

স্বামীজী। কি জানিস্, তোদের দেশের লোকের যথার্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করবার শক্তি কি আছে ? আছে কেবল একটা অহঙ্কার যে, আমরা ভারি সত্ত্বগুণী। তোরা এককালে সাত্ত্বিক ছিলি বটে, কিন্তু এখন তোদের ভারি পতন হয়েছে। সত্ত্ব থেকে পতন হলে একেবারে তমঃ আসে।

তোরা তাই এসেছিস। মনে করেছিস বুঝি, যে নড়েনা চড়েনা, ঘরের ভেতর বসে হরিনাম করে, সামনে অপরের উপর হাজার অত্যাচার দেখেও চুপ করে থাকে, সেই-ই সত্ত্বগুণী—তা নয়, তাকে মহা তমঃ ঘিরেছে। যে দেশের লোক পেটটা ভরে খেতে পায় না, তার ধর্ম্ম হবে কি করে? যে দেশের লোকের মনে ভোগের কোন আশাই মেটে নি, তাদের নিবৃত্তি কেমন করে হবে? তাই আগে যাতে মানুষ পেটটা ভরে খেতে পায় ও কিছু ভোগবিলাস করতে পারে, তারই উপায় কর্, তবে ক্রমে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে ধর্ম্মলাভ হতে পারে। বিলেত-আমেরিকার লোকেরা কেমন জানিস? পূর্ণ রজোগুণী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রকম ভোগ করে এলে গেছে। তাতে আবার কৃশ্চানী ধর্ম্ম—মেয়েলি ভক্তির ধর্ম্ম, পুরাণের ধর্ম্ম! শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে তাতে আর তাদের শান্তি হচ্ছে না। তারা যে অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্কা দিয়ে দিলেই সত্ত্বগুণে পৌঁছায়। তারপর আজ একটা লালমুখ এসে যে কথা বল্‌বে, তা তোরা যত মান্‌বি, একটা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পরা সন্ন্যাসীর কথা তত মান্‌বি কি?

আমি। মহারাজ, এন্. ঘোষও ঠিক ঐ ভাবের কথা বলেছিলেন।

স্বামীজী। হাঁ, আমার সেখানকার চেলারা সব যখন তৈরী হয়ে এখানে এসে তোদের বল্‌বে, "তোমরা কি কর্‌ছ, তোমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম রীতি-নীতি কিসে ছোট? দেখ, তোমাদের ধর্ম্মটাই আমরা বড় মনে করি"—তখন দেখিস্ হুদো হুদো লোক সে কথা শুনবে। তাদের দ্বারা এদেশের বিশেষ উপকার হবে। মনে করিস নি, তারা ধর্ম্মের গুরুগিরি করতে এদেশে আসবে। বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবহারিক শাস্ত্রে তারা তোদের গুরু হবে, আর ধর্ম্মবিষয়ে এদেশের লোক তাদের গুরু

হবে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্ম্মবিষয়ে এই সম্বন্ধ চিরকাল থাক্‌বে।

আমি। তা, স্বামীজী, কেমন করে হবে? ওরা আমাদের যেরকম ঘৃণা করে, তাতে ওরা যে কখন নিঃস্বার্থভাবে আমাদের উপকার করবে, তা বোধ হয় না।

স্বামীজী। ওরা তোদের ঘৃণা করবার অনেকগুলি কারণ পায়, তাই ঘৃণা করে। একে তো তোরা বিজিত, তার উপর তোদের মত 'হাঘোরের দল' আর জগতে কোথাও নেই। নীচ জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে উঠতে বস্‌তে জুতো লাথি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন professional ভিখিরী হয়েছে; তাদের উপরশ্রেণীর লোকেরা দু-এক পাতা ইংরেজী পড়ে আর্জ্জি হাতে করে সকল আফিসের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বিশ টাকার চাকরি খালি হলে পাঁচশো B.A., M.A. দরখাস্ত করে। পোড়া দরখাস্তও বা কেমন!—"ঘরে ভাত নেই, মাগ ছেলে খেতে পাচ্ছে না; সাহেব, দুটি খেতে দাও, নইলে গেলুম!" চাকরিতে ঢুকেও দাসত্বের চূড়ান্ত করতে হয়। এই তো গেল নিম্নশ্রেণীর লোক। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় (?) লোকেরা দল বেঁধে "হায় ভারত গেল! হে ইংরেজ, তোমরা আমাদের লোকদের চাকরি দাও, দুর্ভিক্ষ মোচন কর" ইত্যাদি দিনরাত কেবল "দাও দাও" করে মহা হল্লা করছে। সকল কথার ধুয়ো হচ্ছে—"ইংরেজ, আমাদের দাও!" বাপু, আর কত দেবে? রেল দিয়েছে, তারের খবর দিয়েছে, রাজ্যের সুশৃঙ্খলতা দিয়েছে, ডাকাতের দল প্রায় তাড়িয়েছে, বিজ্ঞানশিক্ষা দিয়েছে। আবার কি দিবে? নিঃস্বার্থ ভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওরা তো এত দিয়েছে, তোরা কি দিয়েছিস?

আমি। আমাদের দেবার কি আছে, মহারাজ? রাজ্যের কর দিই।

স্বামীজী। আমরি! সে কি তোরা দিস, জুতো মেরে আদায় করে—রাজ্যরক্ষা করে বলে। তোদের যে এত দিয়েছে, তার জন্তে কি দিস তাই বল্। তোদের দেবার এমন জিনিস আছে, যা ওদেরও নেই। তোরা বিলেত যাবি, তাও ভিখিরী হয়ে, কি-না বিদ্যে দাও। কেউ গিয়ে বড়জোর তাদের ধর্ম্মের ঝুটো তারিফ করে এলি, বড় বাহাদুরী হলো। কেন, তোদের দেবার কি কিছু নেই? অমূল্য রত্ন রয়েছে, দিতে পারিস্—ধর্ম্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ্, যত উচ্চ ভাব পূর্ব্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল ভারত জনসমাজে ভাবের খনি হয়ে এসেছে; ভাব প্রসব করে সমস্ত জগৎকে ভাব বিতরণ করেছে। আজ ইংরেজ ভারতে এসেছে সেই উচ্চ উচ্চ ভাব, সেই বেদান্তজ্ঞান, সেই সনাতন ধর্ম্মের গভীর রহস্য নিতে। তোরা ওদের নিকট যা পাস্, তার বিনিময়ে তোদের ঐসকল অমূল্য রত্ন দান কর্। তোদের এই ভিখিরী নাম ঘুচাবার জন্তে ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেবল ভিক্ষে কর্‌বার জন্তে বিলেত যাওয়া ঠিক নয়। কেন তোদের চিরকাল ভিক্ষে দেবে? কেউ কখন দিয়ে থাকে? কেবল কাঙ্গালের মত হাত পেতে নেওয়া জগতের নিয়ম নয়। জগতের নিয়মই হচ্ছে আদান-প্রদান। এই নিয়ম যে লোক, বা যে জাত, বা যে দেশ না রাখবে, তার কল্যাণ হবে না। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। তাই আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তাদের ভেতর এখন এতদূর ধর্ম্মপিপাসা যে, আমার মত হাজার হাজার লোক গেলেও তাদের স্থান হয়। তারা অনেকদিন থেকে তাদের ধন-রত্ন দিয়েছে, তোরা এখন অমূল্য রত্ন দে। দেখ্‌বি, ঘৃণাস্থলে শ্রদ্ধাভক্তি পাবি, আর

তোদের দেশের জন্যে তারা অযাচিত উপকার করবে। তারা বীরের জাত, উপকার ভোলে না।

আমি। মহারাজ, ওদেশে লেক্‌চারে আমাদের কত গুণপনা ব্যাখ্যা করে এসেছ; আমাদের ধর্ম্মপ্রাণতার কত উদাহরণ দিয়েছ! আবার এখন বল্‌ছো, আমরা মহা তমোগুণী হয়ে গিছি। অথচ ঋষিদের সনাতন ধর্ম্ম বিলাবার অধিকারী আমাদেরই কর্‌ছো—এ কেমন কথা?

স্বামীজী। তুই কি বলিস্, তোদের দোষগুলো দেশে দেশে গাবিয়ে বেড়াব, না তোদের যা গুণ আছে, সেই গুণগুলোর কথাই বলে বেড়াব? যার দোষ তাকেই বুঝিয়ে বলা ভাল, আর তার গুণ দিয়ে ঢাক বাজানই উচিত। ঠাকুর বল্‌তেন যে, মন্দ লোককে ভাল ভাল কর্‌লে সে ভাল হয়ে যায়; আর ভাল লোককে মন্দ মন্দ কর্‌লে সে মন্দ হয়ে যায়। তাদের দোষের কথা তাদের কাছে খুব বলে এসেছি। এদেশ থেকে যত লোক এ পর্য্যন্ত ওদেশে গেছে, সকলে তাদের গুণের কথাই গেয়ে এসেছে; আর আমাদের দোষের কথাই গাবিয়ে বেড়িয়েছে। কাজেই তারা আমাদের ঘৃণা করতে শিখেছে। তাই আমি তোদের গুণ ও তাদের দোষ তাদের দেখিয়েছি। তোরা যত তমোগুণী হোস্ না কেন, পুরাতন ঋষিদের ভাবটা তোদের ভেতর একটু-না-একটু আছে—অন্ততঃ তার কাঠামোটা আছে। তবে হুট্ করে বিলেত গিয়েই যে ধর্ম্ম-উপদেষ্টা হতে পারা যায়, তা নয়। আগে নিরেলা বসে ধর্ম্ম-জীবনটা বেশ করে গড়ে নিতে হবে; পূর্ণভাবে ত্যাগী হতে হবে; আর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে হবে; তোদের ভেতর তমোগুণ এসেছে—তা কি হয়েছে? তমোনাশ কি হতে পারে না? এক কথায় হতে পারে। ঐ তমোনাশ কর্‌বার জন্যেই তো ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন।

আমি। কিন্তু স্বামীজী, তোমার মত কে হবে?

স্বামীজী। তোরা ভাবিস্, আমি মলে বুঝি আর বিবেকানন্দ হবে না। ঐ যে নেশাখোরগুলো এসে কনসার্ট বাজিয়ে গেল, যাদের তোরা এত ঘৃণা করিস্, মহা অপদার্থ মনে করিস্, ঠাকুরের ইচ্ছে হলে ওরা প্রত্যেকে এক এক বিবেকানন্দ হতে পারে, দরকার হলে বিবেকানন্দের অভাব হবে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এসে হাজির হবে তা কে জানে? এ বিবেকানন্দের কাজ নয় রে; তাঁর কাজ—খোদ রাজার কাজ। একটা গভর্ণর জেনারেল গেলে তাঁর জায়গায় আর একটা আসবেই। তোরা যতই তমোগুণী হোস্ না কেন, মন মুখ এক করে তাঁর শরণ নিলে সব তমঃ কেটে যাবে। এখন যে ও-রোগের রোজা এসেছে। তাঁর নাম করে কাজে লেগে গেলে তিনি আপনিই সব করে নেবেন। ঐ তমোগুণটাই তার সত্ত্বগুণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমি। যাই বল, ও-কথা বিশ্বাস হয় না। তোমার মত Philosophyতে oratory কর্‌বার ক্ষমতা কার হবে?

স্বামীজী। তুই জানিস্ নি। ও ক্ষমতা সকলের হতে পারে। যে ভগবানের জন্য বার বছর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য কর্‌বে, তারই ও ক্ষমতা হবে। আমি ঐরূপ ব্রহ্মচর্য্য করেছি, তাই আমার মাথার ভিতর একটা পর্দ্দা খুলে গিয়েছে। তাই আর আমার দর্শনের ন্যায় জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভেবে বার কর্‌তে হয় না। মনে কর্ কাল বক্তৃতা দিতে হবে, যা বক্তৃতা দেব তার সমস্ত ছবি আজ রাত্রে পর পর চোখের সাম্‌নে যেতে আরম্ভ হয়। পরদিন বক্তৃতার সময় সেইসব বলি। অতএব বুঝ্‌লি তো এটা আমার নিজস্ব শক্তি নয়। যে

অভ্যাস করবে, তারই হবে। তুই কর্, তোরও হবে। আমাদের শাস্ত্রেতেও অমুকের হবে, অমুকের হবে না, তা বলে না।

আমি। মহারাজ, তোমার মনে আছে, তখন তুমি সন্ন্যাস লও নাই, একদিন আমরা অমুকের বাড়ীতে বসেছিলুম; তুমি সমাধি ব্যাপারটা আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলে। কলিকালে ওসব হয় না বলে আমি তোমার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় তুমি জোর করে বলেছিলে, "তুই সমাধি দেখতে চাস্, না সমাধিস্থ হতে চাস্? আমার সমাধি হয়। আমি তোর সমাধি করে দিতে পারি।" তোমার এই কথা বলবার পরেই একজন নূতন লোক এসে পড়লো আর আমাদের ঐ বিষয়ের কোন কথাই চললো না।

স্বামীজী। হাঁ, মনে পড়ে।

আমি তখন আমায় সমাধিস্থ করে দেবার জন্যে তাঁকে বিশেষরূপে ধরায় স্বামীজী বললেন, "দেখ্, গত কয়েক বৎসর ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আর কাজ করে আমার ভেতর রজোগুণ বড় বেড়ে উঠেছে। তাই সে শক্তি এখন চাপা প'ড়েছে। কিছুদিন সব কাজ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে বসলে তবে আবার সে শক্তির উদয় হবে।"

এর দু-এক দিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করবো বলে আমি বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় দুটি বন্ধু এসে উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, তাঁরাও স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে প্রাণায়ামের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কাশীপুরের বাগানে এসে উপস্থিত হলুম। দেখলুম, স্বামীজী হাত মুখ ধুয়ে বাইরে আসছেন। শুধু হাতে দেবতা বা সাধু দর্শন করতে যেতে নেই শুনেছিলুম, তাই আমরা কিছু ফল ও মিষ্টান্ন সঙ্গে এনেছিলুম। তিনি

আসবামাত্র তাঁকে সেইগুলি দিলুম ; স্বামীজী সেগুলি নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকালেন এবং আমরা প্রণাম কর্‌বার আগেই আমাদের প্রণাম কর্‌লেন। আমার সঙ্গের দুটি বন্ধুর মধ্যে একটি তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁকে চিন্‌তে পেরে বিশেষ আনন্দের সহিত তাঁর সমস্ত কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, পরে তাঁর নিকটে আমাদের বসালেন। আমরা যেখানে বসলুম, সেখানে আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর মধুর কথা শুন্‌তে এসেছেন। অন্যান্য লোকের দু-একটি প্রশ্নের উত্তর করে কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজী আপনিই প্রাণায়ামের কথা কইতে লাগ্‌লেন। মনোবিজ্ঞান হতেই জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান সহায়ে প্রথমে তা বুঝিয়ে পরে প্রাণায়াম বস্তুটা কি, বুঝাতে লাগ্‌লেন। এর আগে আমরা কয়জনেই তাঁর 'রাজযোগ' পুস্তকখানি ভাল করে পড়েছিলুম। কিন্তু আজ তাঁর কাছে প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুন্‌লুম, তাতে মনে হল যে তাঁর ভেতর যা আছে, তার অতি অল্পমাত্রই সেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এতে বুঝলুম যে, তাঁর ঐসকল কথা কেবল পুঁথি-পড়া কথা নয়। মন্ত্রদ্রষ্টা ছাড়া ধর্ম্মশাস্ত্রের কূট প্রশ্নসকলের বিজ্ঞান সহায়ে ঐরূপ বিশদ মীমাংসা করা কারও সাধ্য নয়। জগতে পণ্ডিতের অভাব নেই ; কিন্তু সত্যের দ্রষ্টা বা উপলব্ধা বড়ই বিরল। পণ্ডিতের সংখ্যা কমে তাঁর ন্যায় দ্রষ্টার সংখ্যা যদি অধিক হতো, তা হলে ভারতের এ দুর্দ্দিন হতো না।

সেদিন আমরা স্বামীজীর কাছে ৩॥০ টার সময় উপস্থিত হই। তাঁর প্রাণায়াম-বিষয়ক কথা ৭॥০টা পর্য্যন্ত চলেছিল। পরে সভা ভঙ্গ হলে যখন বাইরে এলুম, তখন সঙ্গিদ্বয় আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, তাঁদের প্রাণের ভেতরের প্রশ্ন স্বামীজী কেমন করে জান্‌তে পার্‌লেন ? আমি কি তাঁকে পূর্ব্বেই এ প্রশ্নগুলি জানিয়েছিলুম ?

ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বাগবাজারের পরলোকগত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গিরিশ বাবু, অতুল বাবু, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ এবং আরও দু-একটি বন্ধুর সম্মুখে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, "স্বামীজী, সেদিন আমার সঙ্গে যে দুজন লোক তোমায় দেখতে গিয়েছিল, তুমি এ দেশে আসবার আগেই তারা তোমার 'রাজযোগ' পড়েছিল আর বলে রেখেছিল যে, যদি তোমার সঙ্গে কখন দেখা হয় তো তোমাকে প্রাণায়াম বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু সেদিন তারা কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে না করতেই তুমি তাদের ভেতরের সন্দেহগুলি আপনি তুলে ঐরূপে মীমাংসা করায় তারা আমায় জিজ্ঞাসা করছিল, আমি তোমাকে তাদের প্রশ্নগুলি আগে জানিয়েছিলুম কি-না।"

স্বামীজী বললেন, "ওদেশেও অনেক সময়ে ঐরূপ ঘটনা হওয়ায় অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করতো—আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন কেমন করে জানতে পারলেন? ওটা আমার তত হয় না। ঠাকুরের অহরহ প্রায়ই হতো।"

এই প্রসঙ্গে অতুল বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি 'রাজযোগে' বলেছ যে, পূর্ব্বজন্মের কথা সমস্ত জানতে পারা যায়। তুমি নিজে জানতে পার?"

স্বামীজী। হাঁ, পারি।

অতুল বাবু। কি জানতে পার, বলবার বাধা আছে?

স্বামীজী। জানতে পারি—জানি-ও, কিন্তু details বলবো না।

(২)

নরেন্দ্রনাথ হেদোর ধারে জেনারেল এসেমব্লি কলেজে পড়েন। এফ. এ. সেইখান হইতেই পাশ করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য গুণে সহপাঠীরা অনেকে বড়ই বশীভূত। তাঁহারা তাঁহার গান শুনিতে এতই ভালবাসিতেন যে, অবকাশ পাইলেই নরেনের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তথায় বসিয়া একবার তাঁহার তর্কযুক্তি বা গান-বাজনা আরম্ভ হইলে সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত তাহা বুঝিতে পারিতেন না।

নরেন্দ্র এখন তাঁহার পিত্রালয়ে দুই বেলা কেবল আহার করিতে যান, আর সমস্ত দিবা রাত্র নিকটে রামতনু বসুর গলিতে মাতামহীর বাটীতে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করেন। পাঠাভ্যাসের খাতিরেই যে এখানে থাকেন তাহা নহে। নরেন্দ্র নিভৃতে থাকিতে ভালবাসেন। বাড়ীতে অনেক লোক, বড় গোলমাল, নিশীথে ধ্যানজপের বড়ই ব্যাঘাত। মাতামহীর বাটীতে লোক বেশী নয়, দুই-এক জন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের দ্বারা নরেনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কচি কাঁচা ছেলে—যাহাদের দ্বারাই অধিক গোলমাল হয়—এখানে একটিও নাই। যে ঘরটিতে নরেন থাকেন তাহা বার-বাড়ীর দোতলায়। ঘরের সম্মুখেই উঠিবার সিঁড়ি। অন্দরমহলের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব নাই। সুতরাং তাঁহার বন্ধুবান্ধব—যাঁহার যখন ইচ্ছা—আসিয়া উপস্থিত হন। নরেন নিজের এই অপূর্ব্ব ছোট ঘরটির নাম রাখিয়াছিলেন 'টং'। কাহাকেও সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতে হইলে বলিতেন, "চল, টং-এ

যাই।" ঘরটি বড়ই ছোট, প্রস্থে চারি হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর ময়লা ছোট একটি বালিশ। মেঝের উপর একটি ছেঁড়া সপ পাতা। এক কোণে একটি তম্বুরা। তাহারই নিকট একটি সেতার ও একটি বাঁয়া। বাঁয়া কখন ঐ মাদুরের উপর পড়িয়া থাকে, কখন বা খাটিয়ার নীচে, কখন বা তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে। ঘরের এক পার্শ্বে একটি খেলো হুঁকো, তাহার নিকট খানিকটা তামাকের গুল আর ছাই ঢালিবার একখানি সরা। তাহারই কাছে তামাক, টিকে ও দেশলাই রাখিবার একখানি মৃৎ-পাত্র। আর কুলুঙ্গিতে, খাটের উপর, মাদুরের উপর হেথা সেথা ছড়ান পড়িবার পুস্তক। একটি দেয়ালে একটি দড়ি খাটান, তাহাতে কাপড় পিরান ও একখানি চাদর ঝুলিতেছে। ঘরে দুটি-একটি ভাঙ্গা শিশিও রহিয়াছে—সম্প্রতি তাঁহার পীড়া হইয়াছিল তাহারই নজির। নরেন মনে করিলেই বাড়ী হইতে পরিষ্কার বালিশ, উত্তম বিছানা ও ভাল দ্রব্যাদি আনিয়া দুই-একখানি ছবি প্রভৃতি দিয়া ঘরটি বেশ সাজাইতে পারিতেন। করিতেন না যে, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার ওসমস্ত দিকে কোনও প্রকার খেয়ালই ছিল না। সেজন্য ঘরে সর্ব্বত্র একটা যেন বাসাড়ে বাসাড়ে ভাব। প্রকৃত কথা, আত্মতৃপ্তির বাসনা তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতে কোন বিষয়ে দেখা যাইত না।

নরেন্দ্র আজ মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় কোন বন্ধুর আগমন হইল, বেলা এগারটা। আহারাদি করিয়া নরেন্দ্র পাঠ করিতেছিলেন। বন্ধু আসিয়া নরেনকে বলিলেন, "ভাই, রাত্তিরে পড়িস্, এখন দুটো গান গা।"

অমনি নরেন পড়িবার বই মুড়িয়া একধারে ঠেলিয়া রাখিলেন। তানপুরার জুড়ির তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেতারের সুর বাঁধিয়া নরেন গান ধরিবার আগে বন্ধুকে বলিলেন, "তবে বাঁয়াটা নে।"

বন্ধু কহিলেন, "ভাই, আমি ত বাজাতে জানি নে। ইস্কুলে টেবিল চাপড়ে বাজাই বলে কি তোমার সঙ্গে বাঁয়া বাজাতে পারব?"

অমনি নরেন আপনি একটু বাজাইয়া দেখাইলেন ও বলিলেন, "বেশ করে দেখে নে দিখি। পারবি বই কি। কেন পারবি নি? কিছু শক্ত কাজ নয়। এমনি করে কেবল ঠেকা দিয়ে যা, তা হলেই হবে।" সঙ্গে সঙ্গে বাজনার বোলটাও বলিয়া দিলেন। বন্ধু দুই-একবার চেষ্টা করিয়া কোনরকমে ঠেকা দিতে লাগিলেন, গান চলিল। তানলয়ে উন্মত্ত হইয়া ও উন্মত্ত করিয়া নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলিল—টপ্‌পা, টপ, খেয়াল, ধ্রুপদ, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত। নূতন ঠেকার সময় নরেন এমনি সহজভাবে বোলসহ ঠেকাটি দেখাইয়া দিতেছেন যে, কাওয়ালি, একতালা, আড়াঠেকা, মধ্যমান এমন কি সুরফাঁকতাল পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারা বাজাইয়া লইলেন। বন্ধু মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া নরেনকে খাওয়াইতেছেন ও আপনি খাইতেছেন; সেটা কেবল বাজান-কার্য্য হইতে একটু অবসর না লইলে হাত যে যায়। নরেন্দ্রের কিন্তু গানের কামাই নাই, হিন্দী গান হইলে নরেন তাহার মানে বলিতেছেন ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাবতরঙ্গের সহিত সুরলয়ের অপূর্ব্ব ঐক্য দেখাইয়া বন্ধুকে বিমোহিত করিতেছেন। দিন কোথা দিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল, বাড়ীর চাকর আসিয়া একটি মিটমিটে প্রদীপ দিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দুই জনের হুঁশ হইলে সেদিনকার মত পরস্পর বিদায় লইয়া নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভোজনার্থ চলিয়া গেলেন, বন্ধু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইপ্রকারে নরেনের পাঠে কতই যে ব্যাঘাত ঘটিত তাহা বলা যায় না। নরেনের সহিত এই সময়ে যাঁহারই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে তিনিই এই ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়াছেন। কিন্তু ব্যাঘাত যতই হউক না কেন, নরেন্দ্র নির্ব্বিকার।

একদিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, নরেন অনেক দিন তাঁহার নিকট না যাওয়ায়, তাঁহাকে দেখিবার জন্য রামলালের সঙ্গে কলিকাতায় নরেনের 'টং'-এ আগমন করেন। সেদিন সকালে নরেনের ঘরে দুই সহপাঠী বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্ন্যাল বসিয়া কখন পাঠ করিতেছেন, আবার কখন বা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। এমন সময় বহির্দ্বারে 'নরেন, নরেন' শব্দ শুনা গেল। স্বর শুনিয়াই নরেন অতীব ব্যস্ত হইয়া দ্রুত নীচে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার বন্ধুরাও বুঝিলেন, পরমহংসদেব আসিয়াছেন তাই নরেন এত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে গেলেন। বন্ধুরা দেখিলেন, সিঁড়ির মধ্যস্থলে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে দেখিয়াই অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্‌গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তুই এতদিন যাস্ নি কেন? তুই এতদিন যাস্ নি কেন?" বারংবার এই বলিতে বলিতে ঘরে আসিয়া বসিলেন, পরে আপনার গামছায় বাঁধা সন্দেশ ছিল, খুলিয়া নরেনকে "খা, খা" বলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। নরেনকে দেখিতে যখনই আসেন তখনই কিছু না কিছু অতি উত্তম খাদ্যদ্রব্য তাঁহার জন্য বাঁধিয়া আনেন; মধ্যে মধ্যে লোক দ্বারা পাঠাইয়াও দেন। নরেন একলা খাইবার পাত্র নহেন, তাহা হইতে কতকগুলি সন্দেশ লইয়া অগ্রে তাঁহার বন্ধুদের দিয়া তবে খাইলেন। রামকৃষ্ণ তৎপরে বলিলেন, "ওরে, তোর গান অনেকদিন শুনি নি, গান গা।" অমনি

তানপুরা লইয়া তাহার কান মলিয়া সুর বাঁধিয়া নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন।

ভৈরবী—একতালা

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপিণী।
(তুমি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী)
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী॥
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু, তাপিতা হইল তনু।
মূলাধার ত্যজ শিবে, স্বয়ম্ভু-শিব-বেষ্টিনী॥
গচ্ছ সুষুম্নারি পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত।
মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণী॥
শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে।
ক্রীড়া কর কুতূহলে, সচ্চিদানন্দ-দায়িনী॥

গানও আরম্ভ হইল শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবস্থ হইতে লাগিলেন। গানের স্তরে স্তরে মন ঊর্দ্ধে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, অঙ্গে স্পন্দন নাই, মুখাবয়ব অমানুষী ভাব ধারণ করিল, ক্রমে মর্ম্মরমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন। নরেনের বন্ধুরা পূর্ব্বে কোন মানুষের এরূপ ভাব দেখেন নাই। তাঁহারা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝিবা শরীরে সহসা কোন পীড়া হওয়ায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মহা ভীত হইলেন। দাশরথি তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাঁহার মুখে সিঞ্চন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "জল দেবার দরকার নেই। উনি অজ্ঞান হন নি, ওঁর ভাব হয়েছে! আবার গান শুনতে শুনতেই জ্ঞান হবে

এখন।" নরেন্দ্র এইবার শ্যামাবিষয়ক গান ধরিলেন, "একবার তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ মা শ্যামা"—এইরূপ শ্যামা-বিষয়ক অনেক গান হইল। কৃষ্ণ-বিষয়ক গানও অনেক হইল। গান শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণ কখন ভাবাবিষ্ট হইতেছেন আবার কখন বা সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া গান গাহিলেন। অবশেষে গান শেষ হইলে রামকৃষ্ণ কহিলেন, "দক্ষিণেশ্বর যাবি? কদিন যাস্ নি। চল্ না, আবার এখনই ফিরে আসিস্।" নরেন্দ্র তখনই সম্মত হইলেন। পুস্তকাদি যেমন অবস্থায় পড়িয়াছিল তেমনই পড়িয়া রহিল, কেবল মাত্র তানপুরাটি যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিয়া গুরুদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন, বন্ধুরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের পড়াশুনায় এবংবিধ বহু অন্তরায় তাঁহার অনেক বন্ধুই দেখিয়াছেন, কিন্তু সাহস করিয়া তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না। একদিন উক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বৃথা সময় নষ্ট হয় ভাবিয়া তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "ভাই, ধর্ম্মের জন্যে তোমার যেরকম আবেগ তাতে তুমি নিশ্চয়ই শীঘ্র উৎকৃষ্ট গুরু পাবে।' নরেন্দ্র বেশ বুঝিলেন যে, বন্ধুটি রামকৃষ্ণকে একজন সামান্য ব্যক্তি মনে করিয়াই এইরূপ কহিয়াছেন। নরেন্দ্র বন্ধুর কথায় মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন কথায় কথায় বলিয়া ফেলিলেন,—"ভাই, হরিদাস আমার গুরুদেবকে সামান্য লোক মনে করে। তা সে যা হোক।

'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ী যায়।

তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'"

ইহার বহুকাল পরে লেখকের নিকট হরিদাস এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

"ভাই, তখন কি আমরা পরমহংসদেবকে চিনতে পেরেছিলুম? ভাগ্যগুণে নরেন তাঁকে চিনেছিল, আর আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুই তখন বুঝতে পারি নি।"

হরিদাস এইরূপ কত দুঃখ প্রকাশ করিতেন ও তাঁহার নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিত।

বি. এ. পরীক্ষার জন্ম টাকা জমা দিবার সময় আসিল, সকলেই আপন আপন বেতন ও পরীক্ষার ফী জমা দিল। হরিদাসের অবস্থা ভাল নয়, তাহার উপর এক বৎসর কাল বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া হয় নাই। তখন এইপ্রকার ধারে পড়াশুনা জেনারেল এসেম্ব্লিতে চলিত। পরীক্ষার সময় সমস্ত টাকা আদায় করা হইত। যাহারা নেহাৎ সমস্ত বেতন দিতে অপারগ তাহাদের কিছু কিছু আবার, তেমন তেমন স্থলে সমস্তই, ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এইসমস্ত ছাড়-ছুড়ের ভার রাজকুমার নামক একজন বৃদ্ধ কেরানীর উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত। রাজকুমার সাদাসিদে লোক, একটু-আধটু নেশাটা-আশ্‌টা করেন, কিন্তু গরিব ছাত্রদের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া। তাঁহার দয়ার গুণেই অক্ষম ছাত্রেরা বিনা বেতনেই পড়িতে পায়। বেতন সম্বন্ধে রাজকুমারের উপর কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস প্রগাঢ়। রাজকুমার স্বয়ং তদন্ত করিয়া কাহাকেও অর্দ্ধ বেতনে, কাহাকে বা বিনা বেতনে ভর্ত্তি করেন। রাজকুমার যাহা করেন কর্তৃপক্ষ তাহাই মঞ্জুর করিয়া লন। কাজেই ছাত্রমহলে রাজকুমারের বেজায় প্রতিপত্তি। সকলেই বুড়ো কেরানীকে বড় ভালবাসে, রাজকুমারও ছেলের জহুরী, কে কেমন ছেলে, বেশ পাকা রকম জানেন। নরেনের অক্ষম বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কোনও উপায়ে ফীর টাকার জোগাড় করিয়াছেন, সম্বৎসরের বেতনের টাকা কিন্তু জোগাড় করিতে

না পারিয়া একদিন নরেন্দ্রকে সে কথা জানাইলেন। নরেন্দ্র কহিলেন, "তুই ভাবিস্ নি, একজামিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রস্তুত হ। আমি রাজকুমারকে বলে সব ঠিক করে দেব। তোর মাইনেটা মাপ করিয়ে দেব। কেবল ফীর জোগাড়টা করিস্।"

বন্ধু উত্তর করিলেন, "ভাই, ফীর জোগাড় আছে। মাইনেটা মাপ হলে সব গোল মিটে যায়।"

নরেন কহিলেন, "তবে ভাবনা কি, সব ঠিক হবে এখন।" দুই-এক দিন পরে তাঁহারা দুই বন্ধু একত্রে কেরানী রাজকুমারের ঘরের সম্মুখে পদচারণ করিতে করিতে গল্প করিতেছেন, এমন সময় সেখানে আরও অনেক ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে রাজকুমার আসিলেন। অনেক ছেলেকে একত্র দেখিয়া রাজকুমার একবার সকলের বাকি-বকেয়া বেতনের তাগাদা করিলেন; একটু জোর তাগাদা,—"অমুক দিনের মধ্যে যে মাইনের টাকা না দেবে এবার তাকে পাঠান হবে না।" ছেলেরা রাজকুমারকে ঘেরিয়া আপন আপন দুঃখকাহিনী বলিয়া বকেয়া বেতনের ক্ষমার জন্য আবদার করিতে লাগিল। কতকগুলি ভাল ছেলে রাজকুমারের প্রিয়পাত্র। অন্য ছেলেদের বিষয় তদন্ত করিতে হইলে রাজকুমার অনেক সময় তাহাদের দ্বারাই করেন। নরেন তাহাদের মধ্যে একজন এবং নরেন্দ্র বেশ জানিতেন যে, তাঁহার উপরোধ রাজকুমার এড়াইতে পারিবেন না। রাজকুমারের মাথায় কাঁচায়-পাকায় চুল, গোঁফও তদ্রূপ; কেবল তাহার উপর তামাকের ছোপের দাগ দুই পার্শ্বে; কখন তাঁহার চাপ্‌কানের বা জামার বোতাম দেওয়ার অবকাশ হইত না, কাঁধে চাদরখানি জাহাজী কাছির মত পাকান। রাজকুমার যাইয়া আপনার চেয়ারের হাতলে চাদরখানি বাঁধিয়া তদুপরি

উপবিষ্ট হইলেন। অমনি ঝন্ ঝন্ শব্দে ছেলেরা টাকা জমা দিতে আরম্ভ করিল। রাজকুমারের চারি ধারে বেজায় ভিড়। নরেন্দ্র ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া কহিলেন, "মোশাই, অমুক দেখছি মাইনেটা দিতে পারবে না। তা আপনি একটু অনুগ্রহ করে তাকে মাপ করে দিন। তাকে পাঠালে সে ভাল রকম পাশ হবে। আর না পাঠালে তার সব মাটি হয়।"

রাজকুমার দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "তোকে জ্যাঠামি করে সুপারিস করতে হবে না, তুই যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা। আমি ওকে মাইনে না দিলে পাঠাব না।"

নরেন্দ্র তাড়া খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া আসিলেন। তাঁহার বন্ধুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, অতীব বিমর্ষ হইয়া নরেনের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ক্লাসে চলিলেন। নরেন্দ্র অপদস্থ হইবার পাত্র নহেন, বন্ধুর ভাব দেখিয়া তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া কহিলেন, "তুই হতাশ হচ্ছিস কেন? ও-বুড়ো অমন তাড়াতুড়ি দেয়। আমি বল্‌ছি, তোর একটা উপায় করে দেব, তুই নিশ্চিন্ত হ। আমি যেমন করে পারি তোর একটা উপায় করবো। তোর এক্‌জামিন দিতে পেলেই ত হোল। ভাবিস্ নি ভাই, নিশ্চয় বল্‌ছি তোর উপায় কর্‌বো, এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

বন্ধুর মুখের অন্ধকার ঘুচিয়া পুনরায় তাহাতে আশার আলোক দেখা দিল। বন্ধু ভাবিল, নরেন বড় লোকের ছেলে; বাপ উকিল, তাহার গান শিখিবার জন্য বেতন দিয়া ওস্তাদ রাখেন। নরেন হয় ত বাপকে বলিয়াই অক্ষম বন্ধুর কোন উপায় করিয়া লইবেন, তাই তাঁহার এত আত্মপ্রত্যয়। রাজকুমার যখন বকেয়া বেতন না দিলে পরীক্ষা দিতে পাঠাইবেন না, তখন নরেন নিশ্চয় টাকার জোগাড়ই করিবেন। বন্ধু এইরূপ ভাবিয়া

চিন্তিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নরেন্দ্র কলেজ হইতে বাটী আসিয়া হেদোর ধারে একটু-আধটু বেড়াইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু বাটী না যাইয়া সিমুলিয়ার বাজারের সম্মুখে পদচারণ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে হেদোর দিকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাজারের একটু পশ্চিমে যাইয়া দক্ষিণে একটি গলি, গলির মোড়ের উপরেই গুলির একটি বৃহৎ আড্ডা। ইতোমধ্যে আড্ডায় যাইয়া নরেন আড্ডাধারীর সহিত চুপি চুপি দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আড্ডাধারী বিনা বাক্যব্যয়ে ঘাড় নাড়িয়া "না" বলিল। নরেন আবার হেদোর দিকে দুই-চারি পদ অগ্রসর হইয়াই পার্শ্বের আর একটি গলির ভিতর যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘিরিয়াছে, বেশ গা ঢাকা মত হইয়াছে। এমন সময় গলির মুখে রাজকুমার আসিয়া উপস্থিত। অমনি নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পথরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, নরেন্দ্রনাথের দাঁড়াইবার ভঙ্গি দেখিয়াই রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল, নিজ ভাব চাপিয়া কহিলেন, "কিরে দত্ত, এখানে কেন?"

নরেন্দ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কেন আর কি, আপনার জন্তে দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন মোশাই, আমি বেশ জানি—হরিদাসের অবস্থা বড়ই খারাপ, সে টাকা দিতে পারবে না! তাকে কিন্তু পাঠাতেই হবে, নইলে ছাড়বো না। যদি আমার কথা না রাখেন ত আমিও ইস্কুলে আপনার কথা রটাবো; ইস্কুলে টেঁকা দায় করে তুলবো। এত ছেলের টাকা মাপ করলেন আর ও-বেচারার কেন করবেন না?"

স্থির-প্রতিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথের মুখের ভঙ্গি দেখিয়া রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আদর করিয়া নরেন্দ্রের গলদেশে হাত

জড়াইয়া কহিলেন, "বাবা, রাগ করিস্ কেন? তুই যা বলছিস্ তাই হবে, তাই হবে। তুই যখন বলছিস্, আমি কি তা কর্‌বো না?"

নরেন্দ্র একটু বিরক্তির ভান করিয়া কহিলেন, "তবে কেন সকালবেলা আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন?"

রাজকুমার বলিলেন, "কি জানিস্, তোর দেখাদেখি সব ছোঁড়াগুলো যখন ঐ বায়না ধরবে তখন কাকে রেখে কাকে দেব, বাবা? আমি তখন এক বিষম বিপদে পড়বো। আমায় আড়ালে বলতে হয়। তুই ছেলেমানুষ, ওসব বুঝিস্ নি। কারো সামনে কি কিছু বলে? তুই নিশ্চিন্ত হ। মাইনের টাকাটা মাপ হবে, তবে ফীর টাকা ত আর মাপ হয় না; সেটা দেবে ত?"

নরেন্দ্র কহিলেন, "সেটার উপায় হতে পারে, তবে মাইনেটা আপনাকে ছেড়ে দিতেই হবে, সে এক পয়সা দিতে পারবে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে" বলিয়া রাজকুমার আড্ডার আশে পাশে বেড়াইয়া, নরেন চলিয়া গেলে আড্ডায় ঢুকিলেন।

নরেন্দ্র বুড়োর ভাবগতিক দেখিয়া যাইতে যাইতে মুখে কাপড় চাপিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সহপাঠী বন্ধুটির বাসা নরেন্দ্র-নাথের বাটী হইতে বেশী দূর নহে, চোরবাগানে ভুবনমোহন সরকারের গলিতে। পরদিন প্রত্যূষে বন্ধুর বাসায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়া বন্ধুর ঘরের দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে গান ধরিলেন—

ভয়রোঁ—ঝাঁপতাল

অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র উষাকালে।

ভানু নব তাঁর সেই প্রেম-মুখ-ছায়া
দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে ॥
মধু সমীরণ বহিছে এই যে শুভদিনে,
তাঁর গুণ গান করি অমৃত ঢালে,
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবৎ-নিকেতনে
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে ॥

নরেনের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সহপাঠীরা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কহিলেন, "ওরে, খুব স্ফুর্ত্তি কর, তোর কাজ ফতে হয়েছে, তোর মাইনের টাকাটা আর দিতে হবে না।" এই বলিয়া পূর্ব্বদিনের সমস্ত ঘটনা—রাজকুমারকে ভয় দেখান, ভয়ে তাঁহার কি প্রকার মুখের বিকৃতি হইয়াছিল তাহার নকল, তার পর কেমন করিয়া প্রতিদিন এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া ফস্ করিয়া গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন ইত্যাদি নকলের সঙ্গে গল্প করায় সকলের মধ্যে মহা হাসির রোল উঠিল।

পরীক্ষার আর বেশী দেরি নাই; বোধ হয় মাস খানেকও নাই। বিপুলকলেবর ইংলণ্ডের ইতিহাস (Green's History of England) নরেন্দ্রনাথের একবারও পড়া হয় নাই। পরীক্ষায় পাশ হইতে হইবে বলিয়া নরেন্দ্রনাথের বিশেষ কোন চেষ্টা তাঁহার সহপাঠী বন্ধুরা দেখেন না, মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদের বাসায় চোরবাগানে একটু-আধটু পড়া-শুনা করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু তথায় যাইলে অধিক সময় কথাবার্ত্তা বা গান গাওয়াই হইত। তাঁহার মাতুলালয়ে যে ছোট ঘরটিতে নরেন্দ্র থাকিতেন তাহার উত্তরে দ্বিতলে তদপেক্ষা একটি বড় ঘর, এই ঘরের পশ্চিমে একটি চোর-কুঠরি বা দোছত্রির ঘর ছিল। ঐ বড় ঘরের ভিতর

দিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশের একটি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। হামাগুড়ি দিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিতে হয়, এত ছোট। তাহার দক্ষিণদিকে একটি ছোট জানালা। এই সময় একদিন প্রাতে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহার নিকট যাইয়া "নরেন" বলিয়া ডাকিলে নরেন উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু বন্ধুটি তাঁহাকে ঘরের মধ্যে চারিদিক খুঁজিয়া না পাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন। এমন সময় নরেন কহিলেন, "এই চোর-কুঠরির ভিতর আছি।" সেইখান হইতেই বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কওয়া হইল। পরে বন্ধু শুনিলেন, বিগত দুই দিন ঐ কুঠরির মধ্যে বসিয়া নরেন ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিতেছেন; সংকল্প করিয়া বসিয়াছেন যে, একাসনে বসিয়া পাঠ শেষ করিয়া তবে কুঠরি হইতে বাহির হইবেন। নরেন্দ্র কার্য্যতঃও তাহাই করিলেন। তিন দিনে ঐ বিপুলকায় পুস্তকখানি পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন। পরীক্ষার দিন আসিল, নরেনের কোনও উদ্বেগ বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোনও উৎকণ্ঠা দেখা গেল না।

আজ পরীক্ষার প্রথম দিন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নরেন শয্যা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে করিতে চোরবাগানে হরিদাস ও দাশরথির বাসায় উপস্থিত। বন্ধুরা এখনও শয্যায় শায়িত। তাঁহাদের ঘরের দ্বারে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলেন—

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হোয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।

কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি ;
গাহে যথা রবি শশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত ॥

নরেনের গলার আওয়াজ পাইয়া বন্ধুরা শশব্যস্তে উঠিয়া দরজা খুলিলেন ; দেখিলেন, নরেন আনন্দ-প্রদীপ্ত বদনে একখানি পুস্তক হাতে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন। হয়ত একটু পাঠ করিবেন ভাবিয়া বন্ধুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত, কিন্তু ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গান ধরিয়া যে ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা ছুটাইলেন, তাহার অবরোধ করিয়া পড়াশুনা করা আর সেদিন হইল না। বেলা নয়টা পর্যান্ত "আমরা যে শিশু অতি," "অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি" প্রভৃতি গান ও গল্প চলিল। পাশের ঘরে নরেনের অপর একটি সহপাঠী বাস করিতেন। নরেনের গান প্রথম আরম্ভ হইলেই তিনি তথায় আসিয়া জুটিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ শুনিবার পর পরীক্ষার কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি গানের সভা পরিত্যাগকালে বন্ধুভাবে নরেনকে পরীক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র একটু হাসিলেন মাত্র, কিন্তু গানের স্রোত থামিল না দেখিয়া বন্ধু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। একজন বন্ধু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন, একজামিনের দিন কোথায় একটু-আধটু খুঁৎখাঁৎ যা আছে সেটুকু সেরে নেবে, না তোমার দেখছি সকলই বিপরীত, বেড়ে ফূর্ত্তি কর্‌ছো !"

নরেন উত্তর করিলেন, "হাঁ, তাই ত কর্‌ছি, মাথাটা সাফ্ রাখছি, মগজটাকে একটু জিরেন্ দেওয়া চাই, নইলে এই দু' ঘণ্টা যা মাথায় ঢোকাবে সেটা ঢুকে আগেকার গুলোকে গুলিয়ে দেবে বই ত নয়? এতদিন

পড়ে পড়ে যা হোল না, তাকি আর দু-এক ঘণ্টায় হয়?—হয় না। একজামিনের দিন সকালবেলায় কেবল ফূর্তি, কেবল ফূর্তি করে শরীর-মনকে একটু শান্তি দিতে হয়, ঘোড়াটা ছুটে এলে তাকে দলাই-মলাই করে তাজা করে নিতে হয়। মগজটাকেও তাই কর্‌তে হয়।"

আষাঢ় মাস, সন্ধ্যার কিছু আগে চতুর্দ্দিক অন্ধকার ও ভয়ানক তর্জ্জন-গর্জ্জন করে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। আমরা সেদিন মঠে। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল এসেছেন, নূতন মঠ হচ্ছে দেখবেন ও সেখানে মিসেস্ বুল আছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। মঠের বাড়ীটি সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। পুরানো যে দুই-তিনটি কুটীর আছে, তাহাতে মিসেস্ বুল আছেন। সাধুরা ঠাকুর লইয়া শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে ভাড়া দিয়া বাস করছেন। ধর্ম্মপাল বৃষ্টির পূর্ব্বেই সেইখানে স্বামীজীর কাছে এসে উঠেছেন। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হল, বৃষ্টি আর থামে না। কাজেই ভিজে ভিজে নূতন মঠে যেতে হবে। স্বামীজী সকলকে জুতো খুলে ছাতা নিয়ে যেতে বল্‌লেন; সকলে জুতো খুল্‌লেন। ছেলেবেলার মত শুধু পায় ভিজে ভিজে কাদায় যেতে হবে, স্বামীজীর কতই আনন্দ! একটা খুব হাসি পড়ে গেল। ধর্ম্মপাল কিন্তু জুতো খুল্‌লেন না দেখে স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌লেন, "বড় কাদা, জুতোর দফা রফা হবে।" ধর্ম্মপাল বল্‌লেন, "Never mind, I will wade with my shoes on." এক এক ছাতা নিয়ে সকলের যাত্রা করা হল। মধ্যে মধ্যে কাহারও পা পিছলয়, তার উপর খুব জোর ঝাপটায় সমস্ত ভিজে যায়, তার মধ্যে স্বামীজীর হাসির রোল; মনে হল যেন আবার সেই ছেলেবেলার খেলাই বুঝি করছি। যাহ'ক অনেক খানা-খন্দল পার হয়ে নূতন মঠের সীমানায় আসা গেল। জমিটিতে অনেক বড় বড় খাদ ছিল; দূর হতে মাটি আনিয়ে সব ভরাট করা হয়েছে। যখন সেখানে আসা গেল, তখন

সকলের কাদায় পা বসে যেতে লাগল। ধর্ম্মপাল একে খঞ্জ, তার উপর নূতন মাটির বেজায় কাদা; একবার বেচারার সেই খোঁড়া পা-টি এমন বসে গেল যে, তিনি আর তাকে উদ্ধার করতে পারলেন না। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ফিরে তাঁকে কাঁধ পেতে দিলেন ও ডান হাতে তাঁর কোমর ধরলেন; ধর্ম্মপাল তাঁর কাঁধের উপর ভর দিয়ে মহা কর্দ্দম হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তারপর হাসতে হাসতে দুইজনে সেইভাবেই মঠ পর্য্যন্ত চললেন। স্বামীজী জল আনতে বললেন সকলের পা ধোবার জন্য। জল আনা হলে ধর্ম্মপাল পা ধোবার জন্য একটি ঘটি লইবামাত্র স্বামীজী তাহা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে "আপনি অতিথি—আমি আপনার সৎকার করব" বলে বাঁ হাতে ঘটীটি নিয়ে ডান হাতে পা ধুইয়ে দিতে উদ্যত হলেন। আমি তাই দেখে তাঁর হাত থেকে ঘটীটা কেড়ে নিয়ে গেলাম। তিনি বিরক্ত হয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আমি বললাম, "মহারাজ, আমরা তোমার চেলা; সেবক থাকতে তুমি পা ধুইয়ে দেবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে দেখব, তা ভাল দেখাবে না।" এই বলে তাঁর হাত থেকে ঘটীটা বলপূর্ব্বক কেড়ে নিলে তিনি নিরস্ত হলেন।

সকলের পা হাত ধোয়া হলে মিসেস্ বুলের কাছে সকলে গিয়ে বসলেন এবং অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তার পর ধর্ম্মপালের নৌকা এলে সকলে উঠে গেল। নৌকা আমাদের মঠে নামিয়ে দিয়ে ধর্ম্মপালকে নিয়ে কলিকাতা যাত্রা করল। তখন বেশ টিপীর টিপীর বৃষ্টি পড়ছে।

মঠে এসে স্বামীজী তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীতে ধ্যান করতে গেলেন এবং ঠাকুরঘরে ও তার পূর্ব্বদিকের দালানে বসে সকলে ধ্যানে মগ্ন হলেন। আমার আর সেদিন ধ্যান হল না। পূর্ব্বের কথা সকলই কেবল মনে পড়তে লাগল। ছেলেবেলায় মুগ্ধ হয়ে দেখতাম,

এই অদ্ভুত বালক নরেন আমাদের সঙ্গে কখন হাস্‌ছে, খেল্‌ছে, গল্প করছে, আবার কখন বা সকলের মনোমুগ্ধকর কিন্নরস্বরে গান করছে। ছেলেবেলার ছবিগুলি যেন জীবন্ত হয়ে আমার সম্মুখে পুনরায় রঙ্গ করতে লাগ্‌লো। মনে হল, লোকটার ভিতরে এখন যা দেখছি, সমস্তই তখনও জাজ্বল্যমান ছিল, তখনও দেশের মধ্যে একজন; নইলে তখনও কেন নরেন কথা আরম্ভ করলে সকল ছেলেগুলো হাঁ করে থাক্‌ত? সে একটা মত প্রকাশ করলে তার সঙ্গে তর্ক করে ভুল ধরে দেয় এমন ত একটাও ছেলে ছিল না। সে যে কাজটা কর্‌ত, মনে হত যেন তার চেয়ে ভাল আর কেহই করতে পারে না। ক্লাসে তো বরাবর first (প্রথম) থাক্‌তো। খেলায়ও তাই, ব্যায়ামেও তাই, বালকগণের নেতৃত্বেও তাই, গানেতে ত কথাই নাই, গন্ধর্ব্বরাজ! স্বামীজীরা ধ্যান করতে উঠলেন। বড় ঠাণ্ডা, একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে স্বামীজী তানপুরা ছেড়ে গান ধরলেন। তারপর সঙ্গীতের উপর অনেক কথা চললো। স্বামী শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, "বিলাতী সঙ্গীত কেমন?"

স্বামীজী। খুব ভাল, harmony-র চূড়ান্ত, যা আমাদের মোটেই নাই। তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল যে, ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ডাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর বুঝতে লাগলুম, তখন অবাক হলুম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতাম। সকল art-এর তাই। একবার চোক বুলিয়ে গেলে একটা খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোক নইলে ত তার অন্ধি-সন্ধি কিছুই বুঝবে না। আমাদের দেশের যথার্থ সঙ্গীত কেবল কীর্ত্তনে আর ধ্রুপদে আছে। আর সব ইস্‌লামী ছাঁচে ঢালা হয়ে বিগড়ে গেছে। তোমরা ভাব, ঐ যে বিদ্যুতের মত পিটকিরি

দিয়ে নাকি সুরে টপ্পা গায়, তাই বুঝি দুনিয়ার সেরা জিনিস। তা নয়। প্রত্যেক পর্দায় সুরের পূর্ণবিকাশ না করলে music-এ (গানে) science (বিজ্ঞান) থাকে না। Painting-এ (চিত্রশিল্পে) natureকে (প্রকৃতিকে) বজায় রেখে যত artistic (সুন্দর) কর না কেন ভালই হবে, দোষ হবে না। তেমনি music-এর science বজায় রেখে যত কারদানি কর, ভাল লাগবে। মুসলমানেরা রাগরাগিণীগুলোকে নিলে এদেশে এসে। কিন্তু টপ্পাবাজিতে তাদের এমন একটা নিজেদের ছাপ ফেল্লে যে তাতে science আর রইল না।

প্রশ্ন। কেন, মহারাজ, science মারা গেল ? টপ্পা জিনিসটা কার না ভাল লাগে ?

স্বামীজী। ঝিঁঝি পোকার রবও খুব ভাল লাগে। সাঁওতালরাও তাদের music অত্যুৎকৃষ্ট বলে জানে। তোরা এটা বুঝতে পারিস্ না যে, একটা সুরের উপর (নোটের উপর) আর একটা সুর এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, তাতে আর সঙ্গীতমাধুর্য্য (music) কিছুই থাকে না, উল্‌টে discordance (বে-সুর) জন্মায়। সাতটা পর্দার permutation combination (পরিবর্ত্তন ও সংযোগ) নিয়ে এক-একটা রাগরাগিণী হয় ত ? এখন টপ্পায় এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা তান সৃষ্টি করলে আবার তার উপর গলায় জোয়ারী বলালে কি করে আর তার রাগত্ব থাকবে ? আর টোক্‌রা তানের এত ছড়াছড়ি করলে সঙ্গীতের কবিত্ব-ভাবটা ত একেবারে যায়। টপ্পার যখন সৃজন হয়, তখন গানের ভাব বজায় রেখে গান গাওয়াটা দেশ থেকে একেবারে উঠে গিয়েছিল। আজকাল থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সেটা যেমন একটু ফিরে আসছে, তেমনি কিন্তু রাগরাগিণীর শ্রাদ্ধটা আরও বিশেষ করে হচ্ছে।

এইজন্য যে ধ্রুপদী, সে টপ্পা শুনতে গেলে তার কষ্ট হয়। তবে আমাদের সঙ্গীতে cadence (মিড় মূর্চ্ছনা) বড় উৎকৃষ্ট জিনিস। ফরাসীরা প্রথমে ওটা ধরে, আর নিজেদের music-এ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর এখন ওটা য়ুরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত করে নিয়েছে।

প্রশ্ন। মহারাজ, ওদের musicটা কেবল martial (রণবাদ্য) বলে বোধ হয় আর আমাদের সঙ্গীতের ভিতর ঐ ভাবটা আদতেই নেই যেন।

স্বামীজী। আছে, আছে। তাতে harmonyর (ঐক্যতান) বড় দরকার। আমাদের harmonyর বড় অভাব, এই জন্যই ওটা অত দেখা যায় না, আমাদের music-এর খুবই উন্নতি হচ্ছিল, এমন সময়ে মুসলমানেরা এসে সেটাকে এমন করে হাতালে যে, সঙ্গীতের গাছটি আর বাড়তে পেলে না। ওদের music খুব উন্নত; করুণরস বীররস দুই আছে, যেমন থাকা দরকার। আমাদের সেই কদুকলের আর উন্নতি হল না।

প্রশ্ন। কোন্ রাগরাগিণীগুলি martial ?

স্বামীজী। সকল রাগই martial হয়, যদি harmonyতে বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে বাজান যায়। রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি হয়।

ইতোমধ্যে ঠাকুরের ভোগ হলে পর সকলে ভোজন করতে গেলেন। আহারের পর কলকাতার যে-সকল লোক সেই রাত্রে মঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের শয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে স্বামীজী তারপর নিজে শয়ন করতে গেলেন।

*   *   *

প্রায় দুই বৎসর নূতন মঠ হয়েছে, স্বামীজীরা সেইখানেই আছেন। একদিন প্রাতে আমি গুরুদর্শনে গেছি। স্বামীজী আমায় দেখে হাসতে

হাসতে তর তর করে সমস্ত কুশল এবং কলকাতার সমস্ত খবর জিজ্ঞাসা করে বললেন, "আজ থাকবি ত ?"

আমি "নিশ্চয়" বলে অন্যান্য অনেক কথার পর স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ, ছোট ছেলেদের শিক্ষা দিবার বিষয়ে আপনার মত কি ?"

স্বামীজী। গুরুগৃহে বাস।

প্রশ্ন। কি রকম ?

স্বামীজী। সেই পুরাকালের বন্দোবস্ত। তবে তার সঙ্গে আজকালের পাশ্চাত্ত্য দেশের জড়বিজ্ঞানও চাই। দুটোই চাই।

প্রশ্ন। কেন, আজকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে কি দোষ ?

স্বামীজী। প্রায় সবই দোষ, কেবল চূড়ান্ত কেরানী গড়া কল বই ত নয়। কেবল তাই হলেও বাঁচতুম। মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসবর্জ্জিত হচ্চে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে; বেদকে চাষার গান বলবে। ভারতের বাহিরে যা কিছু আছে, তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর আছে, নিজের কিন্তু সাত পুরুষ চুলোয় যাক্—তিন পুরুষের নামও জানে না।

প্রশ্ন। তাতে কি এসে গেল ? নাই বা বাপ-দাদার নাম জানলে ?

স্বামীজী। না রে; যাদের দেশের ইতিহাস নেই, তাদের কিছুই নেই। তুই মনে কর্ না, যার 'আমি এত বড় বংশের ছেলে' বলে একটা বিশ্বাস ও গর্ব্ব থাকে, সেকি কখন মন্দ হতে পারে ? কেমন করে হবে বল্ না ? তার সেই বিশ্বাসটা তাকে এমন রাশ টেনে রাখবে যে, সে মরে গেলেও একটা মন্দ কাজ করতে পারবে না। তেমনি একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতটাকে রাশ টেনে রাখে, নীচু হতে দেয় না। আমি বুঝেছি, তুই বলবি আমাদের history (ইতিহাস) ত নেই। তোদের মতে

নেই। তোদের Universityর (বিশ্ববিদ্যালয়ের) পণ্ডিতদের মতে নেই, আর এক দৌড়ে বিলেতে বেড়িয়ে এসে সাহেব সেজে যারা বলে আমাদের কিছুই নেই, আমরা বর্ব্বর, তাদের মতে নেই। আমি বলি, অন্যান্য দেশের মত নেই। আমরা ভাত খাই, বিলেতের লোকে ভাত পায় না; তাই বলে কি তারা উপোস করে মরে ভূত হয়ে আছে? তাদের দেশে যা আছে, তারা তাই খায়, তেমনি তোদের দেশের ইতিহাস যেমন থাকা দরকার হয়েছিল, তেমনিই আছে। তোরা চোক বুজে 'নেই, নেই' বলে চ্যাঁচালে কি ইতিহাস লুপ্ত হয়ে যাবে? যাদের চোক আছে, তারা সেই জলন্ত ইতিহাসের বলে এখনও সজীব আছে। তবে সেই ইতিহাসকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করে নিতে হবে। এখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার চোটে লোকের যে বুদ্ধিটি দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই বুদ্ধির মত উপযুক্ত করে ইতিহাসটাকে নিতে হবে।

প্রশ্ন। সে কেমন করে হবে?

স্বামীজী। সে অনেক কথা। আর সেই জন্যই 'গুরুগৃহবাসম্' ইত্যাদি চাই। চাই Western Science-এর (পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের) সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। আর কি জানিস্, ছোট ছেলেদের গাধা পিটে ঘোড়া করা গোছ শিক্ষা দেওয়াটা তুলে দিতে হবে একেবারে।

প্রশ্ন। তার মানে?

স্বামীজী। ওরে, কেউ কাকেও শিখাতে পারে না। শিক্ষক শিখাচ্ছি মনে করেই সব মাটি করে। কি জানিস্, বেদান্ত বলে এই মানুষের ভিতরেই সব আছে। একটা ছেলের ভিতরেও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাজ। ছেলে-গুলো যাতে আপনার আপনার হাত পা নাক কান মুখ চোক ব্যবহার

করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শিখে, এইটুকু করে দিতে হবে। তাহলেই আখেরে সমস্তই সহজ হয়ে পড়বে। কিন্তু গোড়ার কথা ধর্ম্ম। ধর্ম্মটা যেন ভাত আর সবগুলো তরকারি। কেবল শুধু তরকারি খেয়ে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই। যেলা কতকগুলা কেতাবপত্র মুখস্থ করিয়ে মনিষ্যিগুলোর মুণ্ডু বিগড়ে দিচ্ছিল। এক দিক দিয়ে দেখলে তোদের বড়লাটের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। High education (উচ্চ শিক্ষা) তুলে দিচ্ছে বলে দেশটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। বাপ! কি পাশের ধুম, আর দুদিন পরেই সব ঠাণ্ডা! শিখলেন কি? —না, নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন high education থাকলেই কি আর গেলেই বা কি? তার চেয়ে একটু technical education (কারিগরি শিক্ষা) পেলে লোকগুলো কিছু করে খেতে পারবে; চাকরী চাকরী করে আর চ্যাঁচাবে না।

প্রশ্ন। মারওয়াড়ীরা বেশ, চাকরী করে না, আর প্রায় সকলেই ব্যবসা করে।

স্বামীজী। দূর, ওরা দেশটা উচ্ছন্ন দিতে বসেছে। ওদের বড় হীন বুদ্ধি। তোরা ওদের চেয়ে অনেক ভালো—manufacture-এর (শিল্পজাত দ্রব্য-নির্ম্মাণ) দিকে নজর বেশী। ওরা যে টাকাটা খাটিয়ে সামান্য লাভ করে আর গৌরাঙ্গের পেট ভরায়, সেই টাকায় যদি গোটাকতক factory (শিল্পশালা), workshop (কারখানা) করে, তাহ'লে দেশেরও কল্যাণ হয় আর ওদের এর চেয়ে অনেক বেশী লাভ হয়। চাকরী বোঝে না কাবলীরা—স্বাধীনতা-ভাব হাড়ে হাড়ে। ওদের একজনকে চাকরীর কথা বলে দেখিস্ না।

প্রশ্ন। মহারাজ, high education তুলে দিলে সব মানুষগুলো যেমন গরু ছিল, তেমনি আবার গরু হয়ে দাঁড়াবে যে।

স্বামীজী। রাম কহ! তাও কি হয়রে? সিংহ কি কখনো শ্যাল হয়? তুই বলিস্ কি? যে দেশ চিরকাল জগৎকে বিদ্যা দিয়ে এসেছে, Lord Curzon (লর্ড কার্জন) high education তুলে দিলে বলে কি সে দেশশুদ্ধ লোক গরু হয়ে দাঁড়াবে!

প্রশ্ন। যখন ইংরেজ এদেশে আসে নি, তখন দেশের লোক কি ছিল? আজও কি আছে?

স্বামীজী। বেড়ে কলকব্জা তয়ের করতে শিখলেই high education হল না। Life-এর problem solve করা চাই (মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি তা জানা চাই)—যে কথা নিয়ে আজকাল সভ্য জগৎ গভীর গবেষণায় মগ্ন, আর যেটার আমাদের দেশে হাজার বৎসর আগে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন। তবে তোমার সেই বেদান্তও ত যেতে বসেছিল?

স্বামীজী। হ্যাঁ। সময়ে সময়ে সেই বেদান্তের আলো একটু নেব নেব হয়, আর সেই জন্যই ভগবানের আসবার দরকার হয়। আর তিনি এসে সেটাতে এমন একটা শক্তির সঞ্চার করে দিয়ে যান যে আবার কিছুকালের জন্য তার আর মার থাকে না। এখন সেই শক্তি এসে গেছে। তোদের বড়লাট high education তুলে দিলে ভালই হবে।

প্রশ্ন। মহারাজ, ভারত যে সমগ্র জগৎকে বিদ্যা দিয়ে এসেছে, তার প্রমাণ কি?

স্বামীজী। ইতিহাসই তার প্রমাণ। এই ব্রহ্মাণ্ডে যত soul-elevating ideas (প্রাণোদ্দীপক ভাবসমূহ) বেরিয়েছে আর যত কিছু বিদ্যা আছে, অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় তার মূল সব ভারতে রয়েছে।

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে তিনি যেন মেতে উঠলেন। একে ত শরীর

অত্যন্ত অসুস্থ, তাহার উপর দারুণ গ্রীষ্ম, মুহুর্মুহুঃ পিপাসা পেতে লাগল। অনেকবার জল পান করলেন। এবার বললেন, "সিংহ, একটু বরফজল খাওয়া। তোকে সব বুঝিয়ে বলছি।"

জল পান করে আবার বললেন—"আমাদের চাই কি জানিস্? —স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর science পড়ান; চাই technical education, চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরী না করে দু' পয়সা করে খেতে পারে।"

প্রশ্ন। সেদিন টোলের কথা কি বলছিলে?

স্বামীজী। উপনিষদের গল্পটা পড়েছিস্? সত্যকাম গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য করতে গেলেন। গুরু তাঁকে কতকগুলি গরু দিয়ে বনে চরাতে পাঠালেন। অনেকদিন পরে যখন গরুর সংখ্যা দ্বিগুণ হল, তখন তিনি গুরুগৃহে ফেরবার উপক্রম করলেন। এই সময় একটি গরু, অগ্নি এবং অন্যান্য কতকগুলি জন্তু তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। যখন শিষ্য গুরুর বাড়ী ফিরে এলেন, তখন গুরু তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন, শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। এই গল্পের মানে এই—প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করলে, তা থেকেই যথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়।

সেইরকম করে বিদ্যা উপার্জ্জন করতে হবে; শিরোমণি মহাশয়ের টোলে পড়লে রূপী বাঁদরটি থাকবে। একটা জলন্ত character (চরিত্র)-এর কাছে ছেলেবেলা থেকেই থাকা চাই, জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। কেবল মিথ্যা কথা কহা বড় পাপ পড়লে কচুও হবে না। Absolute (অখণ্ড) ব্রহ্মচর্য্য করাতে হবে প্রত্যেক ছেলেটাকেই, তবে না শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসবে। নইলে যার শ্রদ্ধা বিশ্বাস নেই, সে মিছে কথা কেন কইবে না? আমাদের দেশে চিরকাল ত্যাগী লোকের দ্বারাই বিদ্যার প্রচার। পণ্ডিত মশাইরা হাত বাড়িয়ে

বিদ্যাটা টেনে নিয়ে টোল খুলেই দেশের সর্ব্বনাশটা করে বসেছেন। যতদিন ত্যাগীরা বিদ্যাদান করেছেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল।

প্রশ্ন। এর মানে কি মহারাজ? আর সব দেশে ত ত্যাগী সন্ন্যাসী নেই, তাদের বিদ্যার বলে যে ভারত জুতোর তলে রয়েছেন।

স্বামীজী। ওরে বাপ চেল্লাস্ নি, যা বলি শোন। ভারত চিরকাল মাথায় জুতো বইবে যদি ত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা শেখাবার ভার না পড়ে। জানিস্, একটা নিরক্ষর ত্যাগী ছেলে তেরকেলে বুড়ো পণ্ডিতদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পা পূজারী ভেঙ্গে ফেলে। পণ্ডিতরা এসে সভা করে পাঁজিপুঁথি খুলে বললে, 'এ ঠাকুরের সেবা চল্‌বে না, নূতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' মহা হুল-স্থূল ব্যাপার। শেষে পরমহংস মশাইকে ডাকা হল। তিনি বললেন, "স্বামীর যদি পা খোঁড়া হয়ে যায়, তাহলে কি স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে?" পণ্ডিত বাবাজীদের আর টীকে-টীপ্‌পুনি চল্‌ল না। ওরে আহাম্মক, তা যদি হবে ত পরমহংস মহাশয় আসবেন কেন? আর বিদ্যাটাকে এত উপেক্ষা করবেন কেন? বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর সেই নূতন শক্তিসঞ্চার চাই; তবে ঠিক ঠিক কাজ হবে।

প্রশ্ন। সে ত সহজ কথা নয়। কেমন করে হবে?

স্বামীজী। সহজ হলে তাঁর আসবার দরকার হোত না। এখন তোদের করতে হবে কি জানিস্? প্রতি গ্রামে প্রতি শহরে মঠ খুলতে হবে। পারিস্ কিছু করতে? কিছু কর। কোলকাতায় একটা বড় করে মঠ কর। একটা করে সুশিক্ষিত সাধু থাকবে সেখানে, তার তাঁবে practical science (ব্যবহারিক বিজ্ঞান) ও সব রকম art (কলাকৌশল) শিখাবার জন্য প্রত্যেক branch-এ (বিভাগে) specialist (বিশেষজ্ঞ) সন্ন্যাসী থাকবে।

প্রশ্ন। সে রকম সাধু কোথায় পাবে?

স্বামীজী। তয়ের করে নিতে হবে। তাই ত বলি কতকগুলি স্বদেশানুরাগী ত্যাগী ছেলে চাই। ত্যাগীরা যতশীঘ্র এক-একটা বিষয় চূড়ান্ত রকমে শিখে নিতে পারবে, তেমন ত আর কেউ পারবে না।

তারপর স্বামীজী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে তামাক খেতে লাগলেন। পরে বলে উঠলেন, "দেখ্ সিঙ্গি, একটা কিছু কর। দেশের জন্য করবার এত কাজ আছে যে, তোর আমার মত হাজার হাজার লোকের দরকার। শুধু গপ্পিতে কি হবে? দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর্ রে। ছোট ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।

প্রশ্ন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ত অনেকগুলি বই আছে।

এই কথা বলবামাত্র স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন, বল্লেন, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ"; "দুলাল অতি সুবোধ বালক"—ওতে কোন কাজ হবে না। ওতে মন্দ বই ভাল হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাঙ্গালাতে আর কতকগুলি ইংরেজীতে কেতাব করা চাই। সেইগুলি ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।"

বেলা প্রায় ১১টা; ইতঃপূর্ব্বে পশ্চিমদিকে একখানা মেঘ দেখা দিয়াছিল। এখন সেই মেঘ স্বন্ স্বন্ শব্দে চলে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ শীতল বাতাস উঠল। স্বামীজীর আর আনন্দের শেষ নাই; বৃষ্টি হবে। তিনি উঠে "সিঙ্গি, আয় গঙ্গার ধারে যাই" বলে আমাকে নিয়ে ভাগীরথীতীরে বেড়াতে লাগলেন। কালিদাসের মেঘদূত থেকে কত শ্লোক আওড়ালেন, কিন্তু মনে মনে সেই একই চিন্তা করছিলেন—ভারতের মঙ্গল। বল্লেন, "সিঙ্গি, একটা কাজ করতে পারিস্? ছেলেগুলোর অল্প বয়সে বে বন্ধ করতে পারিস্?"

আমি উত্তর করলাম, "মহারাজ, বে বন্ধ করা চুলোয় যাক, বাবুরা যাতে বে সস্তা হয় তার ফিকির কচ্ছেন।"

স্বামীজী। ক্ষেপেছিস্, কার সাধ্যি সময়ের ঢেউ ফেরায়! ঐ হৈচৈ-ই সার। বে যত মাগ্‌গি হয় ততই মঙ্গল। যেমন পাশের ধুম, তেমনি কি বিয়ের ধুম! মনে হয় বুঝি আইবুড়ো আর রইলো না। পরের বছর আবার তেমনি।

স্বামীজী আবার খানিক চুপ করে থেকে পুনরায় বল্লেন, "কতকগুলি অবিবাহিত graduate (গ্রাজুয়েট) পাই ত জাপানে গিয়ে যাতে কারিগরি শিক্ষা (technical education) পেয়ে আসে তার চেষ্টা করা যায়, তাহলে বেশ হয়।

প্রশ্ন। কেন, মহারাজ? বিলেত যাওয়ার চেয়ে কি জাপান যাওয়া ভাল?

স্বামীজী। সহস্রগুণে! আমি বলি এদেশের সমস্ত বড় লোক আর শিক্ষিত লোকে যদি একবার করে জাপান বেড়িয়ে আসে ত লোকগুলোর চোক ফোটে।

প্রশ্ন। কেন?

স্বামীজী। সেখানে এখানকার মত বিদ্যার বদহজম নেই। তারা সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু তারা জাপানীই আছে, সাহেব হয় নাই। তোদের দেশে সাহেব হওয়া যে একটা বিষম রোগ দাঁড়িয়েছে।

আমি বল্লাম, "মহারাজ, আমি কতকগুলি জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে অবাক হতে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাদের নিজস্ব বস্তু, কারও নকল করবার জো নেই।"

স্বামীজী। ঠিক্। ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে

Asiatic (এসিয়াবাসী)। আমাদের দেখছিস্ না সব গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। Asiatic-এর জীবন art-এ মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে Asiatic তাহা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে একটা ধর্ম্মের অঙ্গ। যে মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর। ঠাকুর নিজে একজন কত বড় artist (শিল্পী) ছিলেন!

প্রশ্ন। সাহেবদেরও ত art বেশ।

স্বামীজী। দূর মূর্খ! আর তোরেই বা গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশশুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ, আর পরের রাঙটা সোনা দেখছে। এইটা হচ্ছে আজকালকার শিক্ষার ভেল্‌কি। ওরে, ওরা যতদিন এসিয়ায় এসেছে, ততদিন ওরা চেষ্টা কচ্ছে জীবনে art ঢোকাতে।

আমি বল্‌লাম, "মহারাজ, এরকম কথা লোকে শুন্‌লে বল্‌বে, তোমার সব pessimistic view (নৈরাশ্যবাদী মত)।"

স্বামীজী। কাজেই তাই বই কি! আমার ইচ্ছে করে, আমার চোক দিয়ে তোদের সব দেখাই। ওদের বাড়ীগুলো দেখ সব সাদামাটা। তার কোন মানে পাস্? দেখ্ না এই যে এত বড় বড় সব বাড়ী govern-ment-এর (সরকারের) রয়েছে, বাইরে থেকে দেখলে তার কোন মানে বুঝিস্, বলতে পারিস্? তারপর তাদের খাড়া প্যাণ্ট, চোস্ত কোট, আমাদের হিসেবে এক প্রকার ন্যাংটো। না? আর তারপর কিবে বাহার! আমাদের জন্মভূমিটা ঘুরে দেখ। কোন্ buildingটার (অট্টালিকার) মানে না বুঝতে পারিস্, আর তাতে কিবা শিল্প! ওদের জলখাবার গেলাস, আমাদের ঘটী,—কোন্‌টায় আর্ট আছে? ওরে, একটুকরা Indian silk (ভারতীয় রেশম) চায়নায় (China) নকল করতে হার মেনে গেল। এখন সেটা

Japan (জাপান) কিনে নিলে ২০,০০০৲ টাকায়, যদি তারা পারে চেষ্টা ক'রে। পাড়াগাঁয়ে চাষাদের বাড়ী দেখেছিস্ ?

উত্তর। হ্যাঁ।

স্বামীজী। কি দেখেছিস্ ?

আমি চুপ। কি দেখেছি কি বলব ? বল্লাম, "মহারাজ, বেশ নিকন চিকন পরিষ্কার।"

স্বামীজী। তাদের ধানের মরাই দেখেছিস্ ? তাতে কত আর্ট ! মেটে ঘরগুলোয় কত চিত্তির-বিচিত্তির ! আর সাহেবদের দেশে ছোট লোকেরা কেমন থাকে তাও দেখে আয়। কি জানিস্, সাহেবদের utility (কার্য্যকরিতা) আর আমাদের art. ওদের সমস্ত দ্রব্যেই utility, আমাদের সর্ব্বত্র আর্ট। ঐ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমকি ঘটী ফেলে এনামেলের গেলাস এসেছেন ঘরে। ওই রকমে utility এমন ভাবে আমাদের ভিতর ঢুকেছে যে, সে বদহজম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চাই art এবং utility-র combination (সংযোগ)। জাপান সেটা বড় চট্ নিয়ে ফেলেছে, তাই এত শীঘ্র বড় হয়ে পড়েছে। এখন আবার ওরা তোমার সাহেবদের শিখাবে।

প্রশ্ন। মহারাজ, কোন্ দেশের কাপড় পরা ভাল ?

স্বামীজী। আর্য্যদের ভাল। সাহেবরাও এ কথা স্বীকার করে। কেমন পাটে পাটে সাজান পোশাক। যত দেশের রাজপরিচ্ছদ এক রকম আর্য্যজাতিদের নকল, পাটে-পাটে রাখবার চেষ্টা, আর তাহা জাতীয় পোশাকের ধারেও যায় না। দেখ্, সিঙ্গি, ঐ হতভাগা শার্টগুলো পরা ছাড়।

প্রশ্ন। কেন মহারাজ ?

স্বামীজী। আরে ওগুলো সাহেবদের underwear (অধোবাস)। সাহেবরা ঐগুলো পরার উপর বড় ঘৃণা করে। কি হতভাগা দশা বাঙ্গালীর! যা হোক একটা পরলেই হল? কাপড় পরার যেন মা-বাপ নেই। কারুর ছোঁয়া খেলে জাত যায়, বেচালের কাপড় চোপড় পরলেও যদি জাত যেত ত বেশ হ'ত। কেন, আমাদের নিজের মত কিছু করে নিতে পারিস্ না? কোট shirt (শার্ট) গায় দিতেই হবে, এর মানে কি?

বৃষ্টি এল; আমাদেরও প্রসাদ পাবার ঘণ্টা পড়ল। স্বামীজী "চল্, ঘণ্টা দিয়েছে" বলে আমায় সঙ্গে লয়ে প্রসাদ পেতে গেলেন। আহার করতে করতে স্বামীজী বললেন, "দেখ্ সিদ্ধি, concentrated food (সারভূত খাদ্য) খাওয়া চাই। কতকগুলো ভাত ঠেসে খাওয়া কেবল কুড়েমির গোড়া।" আবার কিছু পরেই বললেন, "দেখ্, জাপানীরা দিনে দু'বার তিনবার ভাত আর দালের ঝোল খায়। কিন্তু খুব জোয়ান লোকেরাও অতি অল্প খায়, বারে বেশী। আর যারা সঙ্গতিপন্ন, তারা মাংস প্রত্যহই খায়। আমাদের যে দুবার আহার কুঁচকি কণ্ঠা ঠেসে। একগাদা ভাত হজম করতে সব energy (শক্তি) চলে যায়।"

প্রশ্ন। আমাদের মাংস খাওয়াটা সকলের পক্ষে সুবিধা কি?

স্বামীজী। কেন কম করে খাবে? প্রত্যহ এক পোয়া খেলেই খুব হয়। ব্যাপারটা কি জানিস্? দরিদ্রতার প্রধান কারণ আলস্য। এক-জনের সাহেব রাগ করে মাইনে কমিয়ে দিলে; কি একটা সংসারে ৩।৪টা রোজগারী ছেলে আছে, তার একটা হয়ত মা নিয়ে নিলেন, বাকীগুলো অমনি কি করলে? না, ছেলেদের দুধ কমিয়ে দিলে, একবেলা হয়ত মুড়ি খেয়ে কাটালে।

প্রশ্ন। তা নয়ত কি করবে?

স্বামীজী। কেন, আরও অধিক পরিশ্রম করে যাতে খাওয়া-দাওয়াটাও বজায় থাকে, এটুকু করতে পারে না? পাড়ায় যে দু' ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া চাই-ই চাই। সময়ের কত অপব্যয় করে লোকে, তা আর কি বলব!

আহারান্তে স্বামীজী একটু বিশ্রাম করতে গেলেন।

*　　　*　　　*

একদিন স্বামীজী বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাটীতে আছেন, আমি তাঁকে দর্শন করতে গেছি। তাঁর সঙ্গে আমেরিকার ও জাপানের অনেক কথা হবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

প্রশ্ন। স্বামীজী, আমেরিকায় কতগুলি শিষ্য করেছ?

স্বামীজী। অনেক।

প্রশ্ন। ২।৪ হাজার।

স্বামীজী। ঢের বেশী।

প্রশ্ন। কি, সব মন্ত্রশিষ্য?

স্বামীজী। হাঁ।

প্রশ্ন। কি মন্ত্র দিলে, স্বামীজী? সব প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়েছ?

স্বামীজী। সকলকে প্রণবযুক্ত দিয়েছি।

প্রশ্ন। মহারাজ, লোকে বলে শূদ্রের প্রণবে অধিকার নাই, তায় তারা ম্লেচ্ছ; তাদের প্রণব কেমন করে দিলে? প্রণব ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও উচ্চারণে অধিকার নাই?

স্বামীজী। যাদের মন্ত্র দিয়েছি তারা যে ব্রাহ্মণ নয়, তা তুই কেমন করে জান্‌লি?

প্রশ্ন। ভারত ছাড়া সব ত যবন ও ম্লেচ্ছের দেশ; তাদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ কোথায়?

স্বামীজী। আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ও কথা ঠিক, ব্রাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই, হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। বাগবাজারে অঘোর চক্রবর্তীর ভাইপো যে মেথর হয়েছে। মাথায় করে গুয়ের হাঁড়ী নে যায়। সেও ত বামুনের ছেলে।

প্রশ্ন। ভাই, তুমি আমেরিকা-ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ কোথায় পেলে ?

স্বামীজী। ব্রাহ্মণজাতি আর ব্রাহ্মণ্যগুণ দুটো আলাদা জিনিস। এখানে সব জাতিতে ব্রাহ্মণ, সেখানে গুণে। যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনটে গুণ আছে জানিস্; তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বলে গণ্য হবার গুণও আছে। এই তোদের দেশে ক্ষত্রিয়-গুণটা যেমন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তেমনি ব্রাহ্মণত্ব গুণটাও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। ওদেশে এখন সব ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব পাচ্ছে।

প্রশ্ন। তার মানে সেখানকার সাত্ত্বিকভাবের লোকদের তুমি ব্রাহ্মণ বলছ ?

স্বামীজী। তাই বটে; সত্ত্ব রজঃ তমঃ যেমন সকলের মধ্যেই আছে— কোনটা কাহার মধ্যে কম, কোনটা কাহারও মধ্যে বেশী, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হবার কয়টা গুণও সকলের মধ্যে আছে। তবে এই কয়টা গুণ সময়ে সময়ে কম বেশী হয়। আর সময়ে সময়ে এক একটা প্রকাশ হয়। একটা লোক যখন চাকরী করে তখন সে শূদ্রত্ব পায়। যখন দুপয়সা রোজগারের ফিকিরে থাকে তখন বৈশ্য, আর যখন মারামারি ইত্যাদি করে তখন তার ভিতর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। আর যখন সে ভগবানের চিন্তায় বা ভগবৎপ্রসঙ্গে থাকে, তখন সে ব্রাহ্মণ। এক জাতি থেকে আর এক জাতি হয়ে যাওয়াও স্বাভাবিক।

বিশ্বামিত্র আর পরশুরাম—একজন ব্রাহ্মণ ও অপর ক্ষত্রিয় কেমন করে হল ?

প্রশ্ন। এ কথা ত খুব ঠিক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে অধ্যাপক আর কুলগুরু মহাশয়েরা সেরকম ভাবে দীক্ষাশিক্ষা কেন দেন না ?

স্বামীজী। ঐটি তোদের দেশের একটি বিষম রোগ। যাক্। সেদেশে যারা ধর্ম্ম করতে শুরু করে, তারা কেমন নিষ্ঠা করে জপতপ, সাধন-ভজন করে !

প্রশ্ন। মহারাজ, তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিসকলও অতি শীঘ্র প্রকাশ পায় শুনতে পাই। সেদিন শরৎ মহারাজের নিকট তাঁর একজন শিষ্য মোট চার মাস সাধনভজন করে তার যে-সকল ক্ষমতা হয়েছে, তার বিষয় লিখে পাঠিয়েছে, শরৎ মহারাজ দেখালেন।

স্বামীজী। হ্যাঁ, তবে বোঝ তারা ব্রাহ্মণ কিনা—তোদের দেশে যে মহা অত্যাচারে সমস্ত যাবার উপক্রম হয়েছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দেন, সেটা তার একটা ব্যবসায়। আর গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটাও কেমন ! ঠাকুর মহাশয়ের ঘরে চাল নেই। গিন্নি বললেন, "ওগো, একবার শিষ্যবাড়ী-টাড়ী যাও ; পাশা খেললে কি আর পেট চলে ?" ব্রাহ্মণ বললেন, "হ্যাঁগো, কাল মনে করে দিও, অমুকের বেশ সময় হয়েছে শুনছি আর তার কাছে অনেক দিন যাওয়াও হয় নি।" এই ত তোদের বাঙ্গালার গুরু ! পাশ্চাত্ত্যে আজও এ প্রকারটা হয় নি। সেখানে অনেকটা ভাল আছে।

*　　　　*　　　　*

প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের দিন এক অপরূপ দৃশ্য দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে এটি যে একটি সুবৃহৎ মেলা তাহায় আর সন্দেহ নাই। তবে অন্যান্য মেলায় নিম্নশ্রেণীর লোকেরই অধিক সমাগম হইয়া থাকে। এখানে

কিন্তু শতকরা ৯৫ জন শিক্ষিত ভদ্রলোক আসিয়া থাকেন। এ মেলাতে কোন প্রকার কেনা-বেচার বিশেষ সংস্রব থাকে না, তাই বোধ হয় নিম্নশ্রেণীর লোকের তত প্রাদুর্ভাব হয় না। মেলামাত্রেই কিছু না কিছু ধর্ম্মসম্বন্ধ আছে, তবে সেই ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসবের আনুষঙ্গিক নানাবিধ হাটবাজার প্রভৃতি বসে বলিয়াই অন্যান্য মেলায় নিম্নশ্রেণীর লোকের অত্যধিক প্রাদুর্ভাব এবং ভয়ানক ভিড় ও ঠেলাঠেলি দেখা যায়। এখানে দশ-বিশ হাজার লোক একত্র হইলেও সেপ্রকার ঠেলাঠেলি হয় না, কারণ, অধিকাংশই শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। কিন্তু এখানেও এক সময়ে এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। ষ্টীমার আসিয়া মঠের কিনারায় লাগিল, আর রক্ষা নাই—সকলকেই আগে নামিতে হইবে। মঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ষ্টীমারে উঠিবার সময়ও ঠিক তদ্রূপ—কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নাই। প্রতিবারই প্রায় দুই-এক জন জলে পড়েন। আমাদের ভিতরে সভ্যতার অসম্পূর্ণতাই ইহার কারণ।

আমরা পাঁচ-সাত জন একত্র হইলেই আমাদের এই অসংযত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সকলেই একসঙ্গে কথা কহিবেন, কেহ কাহারও কথা শুনিবেন না। যদি গান আরম্ভ হইল ত সকলকেই তাহাতে যোগ দিতে হইবে; শিক্ষিত অশিক্ষিত বিচার নাই, সুরে সুর মিলিল না মিলিল ভ্রূক্ষেপ নাই, লজ্জা নাই—যেন ভেড়ার খোঁয়াড়ে আগুন লেগেছে!

স্বামীজীর সঙ্গে একদিন মঠে তাঁহার এক বন্ধুর এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমাদের একটা সেকেলে কথা আছে,—

যদি না পড়ে পো
সভায় নিয়ে থো।

কথাটি খুব পুরাতন। আর সভা মানে সামাজিক এক-আধটা সভা, যা কালেভদ্রে কারও বাড়ীতে হয় তা নয়। সভা হচ্ছে রাজদরবার। আগে আমাদের যে-সকল স্বাধীন বাঙ্গালী রাজা ছিল, তাদের প্রত্যহই সকালে বৈকালে সভা বস্‌ত। সকালে সমস্ত রাজকার্য্য। আর খবরের কাগজ ত ছিল না, সমস্ত মাতব্বর ভদ্রলোকের কাছে রাজ্যের প্রায় সব খবর লওয়া হতো, আর তাতে সেই রাজধানীর সব ভদ্রলোক আস্‌তো। যদি কেউ না আসতো তার খবর হত। এইসকল দরবার-সভাই আমাদের দেশের, কি সমস্ত সভ্য দেশের সভ্যতার centre (কেন্দ্র) ছিল। পশ্চিমে রাজপুতানায় আমাদের এখানকার চেয়ে ঢের ভাল। সেখানে আজও সেই রকমটা কতক হয়।

প্রশ্ন। মহারাজ. এখন দেশী রাজা আমাদের দেশে নাই বলে কি দেশের লোকগুলো এতই অসভ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ?

স্বামীজী। এগুলো একটা অবনতি—যার মূলে স্বার্থপরতা, এ তারই লক্ষণ। জাহাজে ওঠবার সময় 'চাচা আপ্‌না পরাণ বাঁচা,' আর গানের সময় 'হামবড়া'—এই হচ্ছে সব ভিতরের ভাব, একটু self-sacrifice (আত্মত্যাগ) শিক্ষা করলেই ঐটুকু যায়। এটা বাপ-মার দোষ—ঠিক ঠিক সৌজন্যও শেখায় না। সুসভ্যতা self-sacrifice-এর গোড়া।

নিতান্ত বালককালেও স্বামীজী যখন দশ-পনের জনকে লইয়া গান-গল্প করিতেন, তখনও দেখা গিয়াছে একটা হৈচৈ কলরব কখনই ঘটিত না। তাঁর কেমন একটা personality-র (ব্যক্তিত্বের) জোর ছিল এবং তাঁর নিজের একটা সংযত ভাব আগাগোড়া প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক ভঙ্গীতে ছিল। তিনি কথা আরম্ভ করিলে যদি কেহ অন্য কোন প্রসঙ্গ তুলিয়া কথা কহিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসার দ্বারা তাহাকে

সন্তুষ্ট করিয়া তাহার পর নিজের কথা কহিতেন। সেই শৈশবাবস্থাতেও নরেন গান ধরিলে অন্য কেহ তার সঙ্গে ঠিক সুর লয় মিলাইয়া গাহিতে পারিতেন ত ভাল, নতুবা তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া বলিতেন, "তোর হচ্ছে না, ভাই। আগে গানটা যেরকম গাই, মনে মনে গেয়ে শিখে নে; তারপর সঙ্গে সুর মিলিয়ে দুই-এক বার গেয়ে নিতে হয়, নইলে ভাল লাগবে কেন?" বালকের অমনি চৈতন্য হইত।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "বাপ-মার অন্যায় দাবের জন্য ছেলেগুলো যে একটা স্ফূর্তি পায় না। গান গাওয়াটা বড় দোষ—ছেলের কিন্তু একটা ভাল গান শুনলে প্রাণ ছটফট করে, সে নিজের গলায় কেমন করে সেটি বার করবে। কাজেই সে একটা আড্ডা খোঁজে। তামাক খাওয়াটা মহাপাপ—এখন কাজেই সে চাকর-বাকরের সঙ্গে আড্ডা দেবে না ত কি করবে? সকলেরই ভেতর সেই infinite (অনন্ত) ভাব আছে—সে-সব ভাবের কোনরকম স্ফূর্তি চাই। তোদের দেশে তা হবার যো নাই। তা হতে গেলে বাপ-মাদেরও নূতন করে শিক্ষা দিতে হবে। এই ত অবস্থা! সুসভ্য নয়, তার উপর আবার তোদের শিক্ষিত বড় বড় বাবুরা চান কি না—এখনি রাজ্যিটা ইংরেজ তাঁদের হাতে ফেলে দেয় আর তাঁরা রাজ্যিটে চালান। দুঃখুও হয়, হাসিও পায়। আরে সে martial (সামরিক) ভাব কই? তার গোড়ায় যে দাসভাব সাধন করা চাই, নির্ভর চাই—হামবড়াটা martial ভাব নয়। হুকুমে এগিয়ে মাথা দিতে হবে—তবে না মাথা নিতে পারবে। সে যে আপনাকে আগে বলি দিতে হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন ভক্ত-লেখক, যাঁহারা ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহার কোন পুস্তকে তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বামীজী তাঁহাকে ডাকাইয়া উত্তেজিত

হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোর এমন করে সকলকে গাল দিয়ে লেখবার কি দরকার ছিল? তোর ঠাকুরকে বিশ্বাস করে না, তার কি হয়েছে? আমরা কি একটা দল করিছি না কি? আমরা কি রামকৃষ্ণ-ভজা যে, তাঁকে যে না ভজবে সে আমাদের শত্রু? তুই ত তাঁকে নীচু করে ফেল্‌লি, তাঁকে ছোট করে ফেল্‌লি। তোর ঠাকুর যদি ভগবান হন ত যে যেমন করে ডাকুক, তাঁকেই ত ডাক্‌ছে। তবে সবাইকে তুই গাল দেবার কে? না, গাল দিলেই তোর কথা শুনবে? আহাম্মক! মাথা দিতে পারিস্ তবে মাথা নিতে পার্‌বি; নইলে তোর কথা লোকে নেবে কেন?

তিনি একটু স্থির হইয়া যেন গভীর শোকপূর্ণ বচনে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

"বীর না হলে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে; না নির্ভর করতে পারে? বীর না হলে হিংসা দ্বেষ যায় না; তা সভ্য হবে কি? সেই manly (পুরুষোচিত) শক্তি, সেই বীরভাব তোদের দেশে কই?

"নেই, নেই। সেভাব ঢের খুঁজে দেখেছি, একটা বই দুটো দেখ্‌তে পাই নি।"

প্রশ্ন। কার দেখেছ, স্বামীজী?

স্বামীজী। এক G. C.-র (গিরিশচন্দ্রের) দেখেছি যথার্থ নির্ভর; ঠিক দাসভাব; মাথা দিতে প্রস্তুত, তাই না ঠাকুর তার আমমোক্তারনামা নিয়েছিলেন। কি নির্ভর! এমন আর দেখলুম না, নির্ভর তার কাছে শিখেছি।"

এই বলিয়া স্বামীজী হাত তুলিয়া গিরিশ বাবুর উদ্দেশে নমস্কার করিলেন।

স্বামীজী আজীবন কাহারও মনঃকষ্ট দেখিতে পারেন নাই। তাই আজ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন ভক্ত জনসাধারণের নিকট সেই

গুরুতর অপরাধে অপরাধী দেখিয়া লেখককে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। স্বামীজী একে পীড়িত, তাহাতে আবার তাঁকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া সকলে একে একে সরিয়া পড়িলেন।

*　　　*　　　*

দ্বিতীয়বার স্বামীজীর মার্কিনে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে, তিনি অনেকটা ভাল আছেন। একদিন প্রাতে তিনি কলিকাতায় কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া বাগবাজারে ৺বলরাম বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন নৌকা ডাকিতে গিয়াছেন—স্বামীজী এখনি আবার মঠে যাইবেন। ইতোমধ্যে স্বামীজী তাঁহার অন্য একজন বন্ধুকে ডাকাইলেন।

স্বামীজী। চল্, মঠে যাবি আমার সঙ্গে—অনেক কথা আছে।

বন্ধুটি উপবেশন করিলে পর আবার বলিলেন, "আজ বড় মজা হয়েছে। একজনের বাড়ী গেছলুম—সে একটা ছবি আঁকিয়েছে—কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রথের উপর, ঘোড়ার লাগাম হাতে আর অর্জ্জুনকে গীতা বল্‌ছেন। ছবিটা দেখিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়েছে। আমি বললুম, মন্দ কি। সে জিদ করে বল্‌লে, সব দোষগুণ বিচার করে বল কেমন হয়েছে। কাজেই বল্‌তে হল—কিছুই হয় নি। প্রথমতঃ রথটা আজকালের প্যাগোডা রথ নয়, তারপর কৃষ্ণের ভাব কিছুই হয় নি।

প্রশ্ন। কেন প্যাগোডা রথ নয়?

স্বামীজী। ওরে দেশে যে বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ করত না। রাজপুতানায় আজও রথ আছে, অনেকটা সেই সেকেলে রথের মত। Grecian mythology-র (গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর) ছবিতে যে-সব রথ আঁকা আছে, দেখেছিস্?

দু-চাকার, পিছন দিয়ে ওঠা-নাবা যায়—সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁকলেই কি হল? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিসগুলি দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। Truth represent (সত্যকে প্রদর্শন) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না। যত মায়ে-খেদান বাপে-তাড়ান ছেলে—যাদের স্কুলে লেখা পড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় painting (চিত্রবিদ্যা) শিখ্‌তে। তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করান আর একখানা perfect drama (সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক) লেখা, একই কথা।

প্রশ্ন। কৃষ্ণকে কি ভাবে আঁকা উচিত ওখানে?

স্বামীজী। শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস্? সমস্ত গীতাটা personified (মূর্ত্তিমান্) আর তাঁর central ideaটি (মুখ্যভাব), যখন অর্জ্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বল্‌ছেন, তখন তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

এই বলিয়া স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে আঁকা কর্ত্তব্য, সেইমত নিজে অবস্থিত হইয়া দেখাইলেন আর বলিলেন—

"এমনি করে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা দুটো প্রায় হাঁটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ করে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় action (ক্রিয়া) খেল্‌ছে। তাঁর সখা ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর; দু' পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মত রথের উপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেইরকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তার সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মত মুখখানি অর্জ্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের

সখাকে গীতা বল্‌ছেন। এখন গীতার preacher-এর (প্রচারকের) এ ছবি দেখে কি বুঝ্‌লি?

উত্তর। ক্রিয়াও চাই আর গাম্ভীর্য্য স্থৈর্য্যও চাই।

স্বামীজী। অ্যাই!—সমস্ত শরীরে intense action (উগ্র ক্রিয়াশীলতা) আর মুখ যেন নীল আকাশের মত ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হল গীতার central idea (মুখ্যভাব), দেহ জীবন আর প্রাণ মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।

কর্ম্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥

—যিনি কর্ম্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারেন আর বাহ্য কোন কর্ম্ম না করলেও অন্তরে যার ব্রহ্মচিন্তারূপ কর্ম্মের প্রবাহ চল্‌তে থাকে, তিনি মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তাঁরই সব কর্ম্ম করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে যিনি নৌকা ডাকিতে গিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সংবাদ দিলেন নৌকা আসিয়াছে। স্বামীজী যাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন—

"চল্‌, মঠে যাই। বাড়ীতে বলে এসেছিস্‌ ত?"

উত্তর। আজ্ঞা হ্যাঁ।

সকলে কথা কহিতে কহিতে মঠে যাইবার জন্য নৌকায় যাইয়া উঠিলেন।

স্বামীজী। এই ভাব সমস্ত লোকের ভিতর ছড়ান চাই—কর্ম্ম, কর্ম্ম, অনন্ত কর্ম্ম, তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে আর প্রাণ মন সেই রাঙ্গা পায়।

প্রশ্ন। মহারাজ, এ ত কর্ম্মযোগ!

স্বামীজী। হ্যাঁ, এই কর্ম্মযোগ। কিন্তু সাধনভজন না করলে কর্ম্মযোগও হবে না। চতুর্ব্বিধ যোগের সামঞ্জস্য চাই। নইলে প্রাণমন কেমন করে তাঁতে দিয়ে রাখবি?

প্রশ্ন। গীতার কর্ম্ম মানে ত লোকে বলে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, সাধন-ভজন; আর তা ছাড়া সব কর্ম্ম অকর্ম্ম।

স্বামীজী। খুব ভাল কথা, ঠিক কথা; কিন্তু সেটাকে আরও বাড়িয়ে নে না। তোর প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রত্যেক চিন্তার জন্য, তোর প্রত্যেক কাজের জন্য দায়ী কে? তুই ত?

উত্তর। তা বটে, নাও বটে। ঠিক বুঝতে পারচি নি। আসল কথা ত দেখছি গীতার ভাব—ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন ইত্যাদি। তা আমি তাঁর শক্তিতে চালিত, তবে আর আমার কাজের জন্য আমি ত একেবারেই দায়ী নই।

স্বামীজী! ওটা বড় উচ্চ অবস্থার কথা। কর্ম্ম করে চিত্ত শুদ্ধ হলে পর যখন দেখতে পাবি তিনিই সব করাচ্চেন, তখন ওটা বলা ঠিক; নইলে সব মুখস্থ, মিছে।

প্রশ্ন। মিছে কেন, যদি একজন ঠিক বিচার করে বোঝে যে, তিনিই সব করাচ্ছেন!

স্বামীজী। বিচার করে দেখলে পরে তখন। তা সে যখনকার তখনি। তারপর ত নয়। কি জানিস্, বেশ বুঝে দেখ, অহরহঃ তুই যাই করিস্, তুই কর্‌ছিস্ মনে করে কর্‌ছিস্ কিনা। তিনিই করাচ্ছেন, কতক্ষণ মনে থাকে? তবে ঐ রকম বিচার করতে করতে এমন একটা অবস্থা আসবে যে, 'আমি'টা চলে যাবে আর তার জায়গায় হৃষীকেশ এসে বস্‌বেন। তখন 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন' বলা ঠিক হবে। আর বাবা, 'আমি'টি

বুক জুড়ে বসে থাক্‌লে তাঁর আস্‌বার জায়গা কোথায় যে তিনি আস্‌বেন? তখন হৃষীকেশের অস্তিত্বই নেই!

প্রশ্ন। কুকর্ম্মের প্রবৃত্তিটা তিনিই দিচ্ছেন ত?

স্বামীজী। না রে না; ও-রকম ভাবলে ভগবানকে অপরাধী করা হয়। তিনি কুকর্ম্মের প্রবৃত্তি দিচ্ছেন না। ওটা তোর আত্মতৃপ্তির বাসনা থেকেই ওঠে। জোর করে তিনি সব করাচ্ছেন বলে অসৎ কাজ করলে সর্ব্বনাশ হয়। ঐ থেকেই ভাবের ঘরে চুরি আরম্ভ হয়। ভাল কাজ করলে কেমন একটা elation (উল্লাস) হয়। বুক ফুলে ওঠে। বেশ করেছি বলে আপনাকে বাহবা দিবি। এটা ত আর এড়াবার যো নেই, দিতেই হবে। ভাল কাজটার বেলা আমি, আর মন্দ কাজটার সময় তিনি—ওটা গীতা-বেদান্তের বদ্‌হজম, বড় সর্ব্বনেশে কথা, অমন কথা বলিস্ নি। বরং তিনি ভালটা করাচ্ছেন আর আমিই মন্দটা করচি বল্। তাতে ভক্তি আস্‌বে, বিশ্বাস আস্‌বে। তাঁর কৃপা হাতে হাতে দেখতে পাবি। আসল কথা, কেউ তোকে সৃষ্টি করে নি, তুই আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেছিস্ কিনা। বিচার এই, বেদান্ত এই। তবে সেটা উপলব্ধি নইলে বোঝা যায় না। সেইজন্য প্রথমটা সাধককে দ্বৈতভাবটা ধরে নিয়ে চলতে হয়; তিনি ভালটা করান, আমি মন্দটা করি—এইটিই হল চিত্ত-শুদ্ধির সহজ উপায়। তাই বৈষ্ণবদের ভেতর দ্বৈতভাব এত প্রবল। অদ্বৈতভাব গোড়ায় আনা বড় শক্ত। কিন্তু ঐ দ্বৈতভাব থেকে পরে অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি হয়।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন—"দেখ, বিট্‌লেমোটা বড় খারাপ। ভাবের ঘরে চুরি যদি না থাকে, অর্থাৎ যদি প্রবৃত্তিটা বড়ই নীচ হয় অথচ যদি সত্যই তার মনে বিশ্বাস হয় যে এও ভগবান করাচ্ছেন,

তাহলে কি আর বেশীদিন তাকে সেই নীচ কাজ করতে হয়? সব ময়লা চট্ সাফ হয়ে যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা খুব বুঝতো আর আমার মনে হয় বৌদ্ধধর্ম্মের যখন পতন আরম্ভ হল, আর বৌদ্ধদের পীড়নে লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতো—বাবা, দু'মাস ধরে আর যাগ করবার জোটি নেই, একরাত্রেই কাঁচা মাটির মূর্ত্তি গড়ে পূজা শেষ করে তাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে, যেন এতটুকু চিহ্ন না থাকে—সেই সময়টা থেকে তন্ত্রের উৎপত্তি হল। মানুষ একটা concrete (স্থূল) চায়, নইলে প্রাণটা বুঝবে কেন? ঘরে ঘরে ঐ এক রাত্রে যজ্ঞ হতে আরম্ভ হল। কিন্তু প্রবৃত্তি সব sensual (ইন্দ্রিয়গত) হয়ে পড়েছে। ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, 'কেউ কেউ নর্দ্দমা দিয়ে পথ করে'; তেমনি সদ্‌গুরুরা দেখলেন যে, যাদের প্রবৃত্তি নীচ বলে কোন কাজের অনুষ্ঠান করতে পারছে না, তাদেরও ধর্ম্মপথে ক্রমশঃ নিয়ে যাওয়া দরকার। তাদের জন্যই ঐ সব বিটকেল তান্ত্রিক সাধনার সৃষ্টি হয়ে পড়ল।

প্রশ্ন। মন্দ কাজের অনুষ্ঠান ত সে ভাল বলে করতে লাগলো, এতে তার প্রবৃত্তির নীচতা কেমন করে যাবে?

স্বামীজী। ঐ যে প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিলে—ভগবান পাবে বলে কচ্চে।

প্রশ্ন। মহারাজ, সত্যসত্যই কি তা হয়?

স্বামীজী। সেই একই কথা; উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হবে, না হবে কেন?

প্রশ্ন। পঞ্চ 'মকার'-সাধনে কিন্তু অনেকের মন মদমাংসে পড়ে যায়।

স্বামীজী। তাই পরমহংস মশাই এসেছিলেন। ওভাবে তন্ত্রসাধনার

দিন গেছে। তিনিও তন্ত্রসাধন করেছিলেন, কিন্তু ওরকম ভাবে নয়। মদ খাবার বিধি যেখানে, সেখানে তিনি একটা কারণের ফোঁটা কাটতেন। তন্ত্রটা বড় slippery ground (পিচ্ছিল ভূমি)। এই জন্য বলি, এদেশে তন্ত্রের চর্চ্চা চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আরও উপরে যাওয়া চাই। বেদের চর্চ্চা চাই। চতুর্ব্বিধ যোগের সামঞ্জস্য করে সাধন করা চাই, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য চাই।

প্রশ্ন। চতুর্ব্বিধ যোগের সামঞ্জস্য কি রকম?

স্বামীজী। জ্ঞানবিচার বৈরাগ্য, ভক্তি, কর্ম্ম আর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা আর স্ত্রীলোকের প্রতি পূজ্যভাব চাই।

প্রশ্ন। স্ত্রীলোকের প্রতি পূজ্য ভাব কি করে আসে?

স্বামীজী। ওরাই হল আদ্যাশক্তি। যেদিন আদ্যাশক্তির পূজো আরম্ভ হবে, যেদিন মায়ের কাছে প্রত্যেক লোক আপনাকে আপনি নরবলি দেবে, সেই দিনই ভারতের যথার্থ মঙ্গল শুরু হবে।

এই কথা বলিয়া স্বামীজী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন। আজ স্বামীজীর কথানুযায়ী কার্য্য করিতে কয়জন প্রস্তুত? জন্মাবধি তাঁর অহর্নিশ ভারতের মঙ্গলচিন্তা। অনশনে, পদব্রজে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে, শীতে সমভাবে আত্মবৎ জন্মভূমি পর্য্যটন করিয়া দরিদ্র ভারত-সন্তানের দারিদ্র্যে বিগলিত-হৃদয় হইয়া একাকী প্রান্তরে পর্ব্বতে কাননে নদীসৈকতে মা সর্ব্বমঙ্গলার চরণে কতই রুধিরাশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন! উলঙ্গ, অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ, কঙ্কালবিশিষ্ট ভারত-সন্তানকে দেখিয়া শোকে উন্মত্ত হইয়া আপনার একমাত্র উত্তরীয় স্বহস্তে পরিধান করাইয়া তাহাকে 'আয় ভাই আয়' বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া কতই কাঁদিয়াছেন! রাজদরবারের নিমন্ত্রণ, দেবভোগ্যান্ন, দুগ্ধফেননিভ শয্যা প্রত্যাখ্যান করিয়া দারিদ্র্যভার-নিপীড়িতা জীর্ণাশীর্ণা কুটীরবাসিনী বৃদ্ধার ভিক্ষান্ন ও তৃণশয্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করিয়াছেন। এইসকল দরিদ্র অনাথ অজ্ঞ—ইহারাই বিবেকানন্দের ভগবান ছিল। ইহারই নাম স্বদেশবাৎসল্য—ইহাই যথার্থ ত্যাগ। ত্যাগ ব্যতীত স্বদেশবাৎসল্য কোথায়?

একদিন তাঁহার কতকগুলি বাল্যবন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন, "স্বামীজী, তুমি যে ছেলেবেলায় বে করতে বললে বলতে, 'বে করব না, আমি কি হব দেখবি।' তা যা বলেছিলে, তাই করলে।"

স্বামীজী। হ্যাঁ ভাই, করেছি বটে। তোরা ত দেখেছিস্ খেতে পাই নি, তার উপর খাটুনী। বাপ, কতই না খেটেছি! আজ আমেরিকানরা ভালবেসে এই দেখ কেমন খাট বিছানা গদি দিয়েছে! দুটো খেতেও পাচ্ছি। কিন্তু ভাই, ভোগ আমার অদৃষ্টে নেই। গদিতে শুলেই রোগ বাড়ে, হাঁপিয়ে মরি। আবার মেজেয় এসে পড়ি, তবে বাঁচি।

রক্ত-মাংসের শরীর, কতই সহ্য হবে? এই দারুণ পরিশ্রমের ফলে, শোকে, ভারতের আধ্যাত্মিক ও বাহ্য দুর্ভিক্ষজনিত অহরহঃ চিন্তার তাড়নে অকালে দেহত্যাগ হইল। আজ তিনি তাঁহার দেহের বিনিময়ে ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা ভারতের কুসন্তান, কুলাঙ্গার; আমরা কৃতজ্ঞতা জানি না, ভালবাসা জানি না, তিলমাত্র স্বার্থত্যাগ জানি না। যদি জানিতাম, আজ দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে বিবেকানন্দের আদর্শে এক-একটি Bachelor's Association (চিরকুমার-সঙ্ঘ) সমুত্থিত হইত, মাতৃভক্ত বঙ্গবাসী আপনার তপ্ত রুধিরে ভারত-ভারতীর দারুণ ক্ষুৎপিপাসা দূর করিত, ঘরে ঘরে নররক্তমাংসে দুঃখিনী ভারতমাতার রাঙ্গাপদে পাদ্যার্ঘ্য দিয়া জয়ডঙ্কায় মেদিনী পূরিত, বিবেকানন্দের অনুষ্ঠিত নরমেধযজ্ঞের উদ্‌যাপন হইত, নররুধিরলোলুপা অসুর-নাশিনীর অনশন ঘুচিত! হায়, এমন দিন কবে হবে?

স্বামীজীর স্মৃতি

২২শে জানুয়ারী, ১৮৯৮ সাল। ১০ই মাঘ শনিবার। সকালে উঠিয়াই হাতমুখ ধুইয়া বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ বলরাম বাবুর বাটীতে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হইয়াছি। একঘর লোক। স্বামীজী বলিতেছেন, "চাই শ্রদ্ধা, নিজেদের উপর বিশ্বাস চাই। Strength is life, weakness is death (সবলতাই জীবন, দুর্ব্বলতাই মৃত্যু)। আমরা আত্মা, অমর, মুক্ত—pure, pure by nature (স্বভাবতঃ পবিত্র)। আমরা কি কখনও পাপ করিতে পারি? অসম্ভব। এইরকম বিশ্বাস চাই। এই বিশ্বাসই আমাদের মানুষ করে, দেবতা করে তোলে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা হারিয়েই ত দেশটা উৎসন্ন গিয়েছে।"

প্রশ্ন। এই শ্রদ্ধাটা আমাদের কেমন করে নষ্ট হল?

স্বামীজী। ছেলেবেলা থেকে আমরা negative education (নেতি-মূলক শিক্ষা) পেয়ে আস্‌ছি। আমরা কিছু নই,—এ শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখন জন্মেছে, তা আমরা জান্‌তেই পাই না। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখান হয় নি। হাত-পার ব্যবহার ত জানিই নি। ইংরেজদের সাতগুষ্টির খবর জানি, নিজের বাপ-দাদার খবর রাখি না। শিখেছি কেবল দুর্ব্বলতা। জেনেছি যে আমরা বিজিত দুর্ব্বল, আমাদের কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নেই। এতে আর শ্রদ্ধা নষ্ট হবে না কেন? দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আন্‌তে হবে। নিজেদের উপর বিশ্বাসটা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তা

হলেই দেশের যত কিছু problems (সমস্যাগুলি) ক্রমশঃ আপনা আপনিই solve (মীমাংসিত) হয়ে যাবে।

প্রশ্ন। সব দোষ শুধরে যাবে, তাও কি কখন হয়? সমাজে কত অসংখ্য দোষ রয়েছে! দেশে কত অভাব রয়েছে, যা পূরণ করবার জন্য কংগ্রেস প্রভৃতি অন্যান্য দেশহিতৈষী দল কত আন্দোলন ও ইংরেজ বাহাদুরের কাছে কত প্রার্থনা কর্‌ছে! এ-সব অভাব কিসে পূরণ হবে?

স্বামীজী। অভাবটা কার? রাজা পূরণ কর্‌বে, না তোমরা পূরণ করবে?

প্রশ্ন। রাজাই অভাব পূরণ করবেন। রাজা না দিলে আমরা কোথা থেকে কি পাব, কেমন করে পাব?

স্বামীজী। ভিখিরীর অভাব কখনও পূর্ণ হয় না। রাজা অভাব পূরণ করলে সব রাখ্‌তে পার্‌বে, সে লোক কই? আগে মানুষ তৈরী কর। মানুষ চাই। আর শ্রদ্ধা না আস্‌লে মানুষ কি করে হবে?

প্রশ্ন। মহাশয়, majority-র (অধিকাংশের) কিন্তু এ মত নয়।

স্বামীজী। Majority-রা (অধিকাংশ) ত fools (নির্ব্বোধ), men of common intellect (সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন); মাথাওয়ালা লোক অল্প। এই মাথাওয়ালা লোকেরাই সব কাজের সব department-এরই (বিভাগেরই) নেতা। এদেরই ইঙ্গিতে majority-রা (অধিকাংশ) চলে। এদেরই আদর্শ করে চল্‌লে কাজও সব ঠিক হয়। আহাম্মকেরাই শুধু হাম্‌বড়া হয়ে চলে, আর মরে। সমাজ-সংস্কার আর কি কর্‌বে? তোমাদের সমাজ-সংস্কার মানে ত বিধবার বিয়ে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা বা ঐ রকম আর কিছু। তোমাদের দুই-এক বর্ণের সংস্কারের কথা বলছ ত? দুই-চার জনের সংস্কার হল, তাতে সমস্ত জাতটার কি এসে যায়? এটা

সংস্কার না স্বার্থপরতা? নিজেদের ঘরটা পরিষ্কার হল, আর যারা মরে মরুক।

প্রশ্ন। তা হলে কি কোন সমাজ-সংস্কারের দরকার নেই বলেন?

স্বামীজী। দরকার আছে বইকি। আমি তা বল্‌ছি না। তোমাদের মুখে যা সংস্কারের কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরীব সাধারণদের স্পর্শ-ই করবে না। তোমরা যা চাও, তাদের তা আছে। এজন্য তারা ওগুলোকে সংস্কার বলেই মনে করবে না। আমার কথা এই যে, শ্রদ্ধার অভাবই আমাদের মধ্যে সমস্ত evils (অনর্থ) এনেছে ও আরও আন্‌ছে। আমার চিকিৎসা হচ্ছে রোগের কারণকে নির্ম্মূল করা—রোগ চাপা দিয়ে রাখা নয়। সংস্কার আর দরকার নেই? যেমন ভারতবর্ষে inter-marriageটা (অন্তর্বিবাহ) হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্ব্বলতা এসেছে।

* * *

সেদিন সূর্য্যগ্রহণ। বক্সারে পূর্ণগ্রাস দেখা যাইবে। দেশ-বিদেশ হইতে অনেকে সে দৃশ্য দেখিতে আসিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তাঁহাদের সময়োপযোগী যন্ত্রাদি লইয়া প্রকৃতির নূতন তত্ত্ব যদি কিছু আবিষ্কৃত হয়, তাহা আবিষ্কার করিতে আসিয়াছেন। এই সব কথা শ্রোতাদিগের মধ্যে দুই-এক জন আলোচনা করিতে লাগিলেন। স্বামীজীকেও ঐসব ভদ্রবেশীদিগের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের কথা বলিতে লাগিলেন। যে শ্রোতা এতক্ষণ প্রশ্ন করিতেছিলেন, তিনি সকলকে একটু ব্যস্ত দেখিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'আমি আর একদিন আস্‌ব। আজ গঙ্গাস্নান করতে হবে। বাসাটা অনেক দূর, এখন আসি।"

* * *

২৩শে জানুয়ারী, ১৮৯৮ সাল। ১১ই মাঘ, রবিবার। বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে সন্ধ্যার পর আজ সভা হইয়াছে। স্বামীজী উপস্থিত আছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। স্বামীজী পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। বারাণ্ডাটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ দিকের ও উত্তর দিকের বারাণ্ডাও সেইরূপ লোকে পরিপূর্ণ। স্বামীজী কলিকাতায় থাকিলে নিত্যই এইরূপ হইত। স্বামীজী সুন্দর গান গাহিতে পারেন, অনেকে শুনিয়াছেন। অধিকাংশের গান শুনিবার ইচ্ছা দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় ফিস্ ফিস্ করিয়া দুই-এক জনকে, স্বামীজীর গান শুনিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। স্বামীজী নিকটেই ছিলেন, মাষ্টার মহাশয়ের কাণ্ড দেখিতে পাইলেন।

স্বামীজী। কি বল্‌ছ, মাষ্টার, বল না? ফিস্ ফিস্ করছ কেন?

মাষ্টার মহাশয়ের অনুরোধক্রমে অতঃপর স্বামীজী "যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে" গানটি ধরিলেন। যেন বীণার ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল। যাঁহারা তখনও আসিতেছেন, সত্যই তাঁহারা সিঁড়ি হইতে যেন গানটি বেহালার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গীত হইতেছে মনে করিলেন। গান শেষ হইলে স্বামীজী মাষ্টার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হয়েছে ত? আর গায় না। নেশা ধরে যাবে। আর গলাটা লেক্‌চার দিয়ে দিয়ে মোটা হয়ে গেছে। voiceটা (গলার স্বর) roll করে (কাঁপে)। * *

অতঃপর স্বামীজী এক শিষ্য ব্রহ্মচারীকে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারীটি সভাস্থলে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতান্তে শচীন বাবু ও আর দুই-এক জন বক্তৃতার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিলেন। স্বামীজী তাঁহার অনুগত আর একজন গৃহীকে

বলিলেন, "এর সপক্ষে বা বিপক্ষে যদি কিছু বলবার থাকে ত বল্।" গৃহী ভক্তটি দুই-একটি কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, এমন সময় শচীন বাবু আবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বক্তা যে বলিলেন, 'ভক্তিটা হীন অধিকারীর জন্য', এটা কেমন কথা? যতক্ষণ শরীর থাকবে ততক্ষণ দ্বৈত থাকবেই। সমাধি না হলে ত এক জ্ঞান হয় না। আর সেই অবস্থাতেই একত্বের অনুভূতি হতে পারে, কিন্তু সমাধিভঙ্গের পর আর তা থাকে না।" গৃহী যুবকটি অতঃপর দ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইলেন। বলিলেন, "এক ভিন্ন দুই নেই, দ্বৈত-দ্বৈত আবার কি? দ্বৈত করতে করতে দ্বৈতই থাকে।" ইত্যাদি। ইহার পর গৃহী যুবাটির সহিত শচীন বাবুর ঘোরতর তর্কযুদ্ধ বাধিয়া গেল। তর্ক ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দ স্বামী উভয়ে তর্ক-বিতর্ক থামাইয়া দিলেন।

স্বামীজী। রেগে উঠ্‌লি কেন? তোরা বড় গোল করিস্। তিনি (পরমহংসদেব) বল্‌তেন, 'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক।' ভক্তিমতে ভগবানকে প্রেমময় বলা হয়। তাঁকে ভালবাসি একথাও বলা যায় না। তিনি যে ভালবাসাময়। যে ভালবাসাটা হৃদয়ে আছে, তাই যে তিনি। এইরূপ যার যে টান, সে সমস্তই তিনি। চোর চুরি করে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি করে, মায়ে ছেলেকে ভালবাসে—সে-সব জায়গায়ই তিনি। একটা জগৎ আর একটাকে টান্‌ছে, সেখানেও তিনি। সর্ব্বত্রই তিনি। জ্ঞানপক্ষেও সর্ব্বস্থানে তাঁকে অনুভূত হয়। এইখানেই জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য। যখন ভাবে ডুবিয়া যায়, অথবা সমাধি হয়, তখনই দ্বিভাব থাক্‌তে পারে না, ভক্তের সহিত ভগবানের পৃথকত্বও থাকে না। ভক্তি-শাস্ত্রে ভগবানলাভের জন্য পাঁচ ভাবে সাধনের কথা আছে, আর এক ভাবের সাধন তাতে যোগ করা যেতে পারে—ভগবানকে অভেদভাবে সাধন

করা। ভক্তেরা অদ্বৈতবাদীদের অভেদবাদী ভক্ত বলিতে পারেন। মায়ার ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ দ্বৈত থাকবেই। দেশ, কাল, নিমিত্ত বা নাম-রূপের নামই মায়া। যখন এই মায়ার পারে যাওয়া যায় তখনই একত্ববোধ হয়। তখন মানুষ দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী থাকে না, তার কাছে তখন সব এক, এই বোধ হয়। জ্ঞানী ও ভক্তের তফাৎ কোথায় জানিস্? একজন ভগবানকে বাহিরে দেখে আর একজন ভগবানকে ভিতরে দেখে। তবে ঠাকুর বল্‌তেন, ভক্তির আর এক অবস্থাভেদ আছে, যাকে পরাভক্তি বলা যায়। মুক্তিলাভ করে, অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থিত হয়ে তাঁকে ভক্তি করা। যদি বলা যায়,—মুক্তিই যদি হয়ে গেল, তবে আবার ভক্তি করবে কেন? এর উত্তর এই,—মুক্ত যে, তার পক্ষে কোন নিয়ম বা প্রশ্ন হতে পারে না। মুক্ত হয়েও কেহ কেহ ইচ্ছে করে ভক্তি রেখে দেয়।

প্রশ্ন। মশায়, এ ত বড় মুশ্‌কিলের কথা। চোরে চুরি করবে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি করবে, সেখানেও ভগবান; তা হলে ভগবানই ত সব পাপের দায়ী হলেন।

স্বামীজী। ঐরকম জ্ঞান একটা অবস্থার কথা। ভালবাসা মাত্রকেই যখন ভগবান বলে বোধ হবে, তখনই কেবল ঐ রকম মনে হতে পারে। সেই রকম হওয়া চাই। ভাবটার realisation (উপলব্ধি) হওয়া দরকার।

প্রশ্ন। তা হলেও ত বলতে হবে, পাপেতেও তিনি।

স্বামীজী। পাপ আর পুণ্য বলে আলাদা জিনিস ত কিছু নেই। ওগুলো ব্যবহারিক কথামাত্র। আমরা কোন জিনিসের একরকম ব্যবহারের নাম পাপ ও আর একরকম ব্যবহারের নাম পুণ্য দিয়া থাকি। যেমন এই আলোটা জ্বলার দরুন আমরা দেখতে পাচ্ছি ও কত কাজ করছি, আলোর

এই একরকম ব্যবহার। আবার এই আলোতে হাত দাও হাত পুড়ে যাবে। এটা ঐ আলোর আর এক রকম ব্যবহার। অতএব ব্যবহারের জিনিসটা ভাল মন্দ হয়ে থাকে। পাপ-পুণ্যটাও ঐ রকম। আমাদের শরীর ও মনের কোন শক্তিটার সুব্যবহারের নামই পুণ্য এবং কুব্যবহার বা অপচয়ের নাম পাপ।

তাহার পর প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। একজন বলিলেন, "একটা জগৎ আর একটাকে টানে, সেখানেও ভগবান,—এ কথা সত্য হ'ক আর না হ'ক, এর মধ্যে বেশ poetry (কবিত্ব) আছে।"

স্বামীজী। নাহে বাপু, ওটা poetry (কবিত্ব) নয়। ওটা জ্ঞান হলে দেখতে পাওয়া যায়।[১] তাহার পর আবার প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। Mill (মিল্), Hamilton (হ্যামিল্টন), Herbert Spencer (হার্বার্ট স্পেন্সার) ইত্যাদির দর্শন হইতে প্রশ্ন হইতে লাগিল। স্বামীজী সকলেরই যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। উত্তরে সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার উত্তরদানে তৎপরতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শেষে আবার প্রশ্ন হইল।

---

১ স্বামীজীর ঐ কথাতে আমি এই বুঝিয়াছিলাম যে, জড় ও চেতন ব্যবহারিক কথায় পৃথক্ পৃথক্ বস্তু হইলেও, এক বস্তুরই রূপান্তর মাত্র এবং তদ্রূপ জড় বা অন্তর্জগতে যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি, সে-সমস্ত এক শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশে প্রতীত হইয়া থাকে। সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় জড়, এমন কোন বস্তু নাই। যেটিকে আমরা বস্তুর চেতন অবস্থা দেখিয়া থাকি, যে অবস্থাসমূহে তদপেক্ষা স্বল্প শক্তি প্রকাশিত হয়, সেই অবস্থাসমূহই বস্তুর জড়াবস্থা বলিয়া উপলব্ধি হয়। যে শক্তি জড় অবস্থায় আকর্ষণরূপে প্রকাশিত থাকে, তাহাই আবার চেতনাবস্থায় সূক্ষ্মতর হইয়া ভালবাসাদিরূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। ব্যবহারিক প্রভেদই বা হয় কেন? লোকের কোন শক্তি মন্দরূপে ব্যবহার করতে প্রবৃত্তিই বা হয় কেন?

স্বামীজী। নিজের নিজের কর্ম্ম অনুসারে প্রবৃত্তি হয়, সবই নিজের কর্ম্মকৃত; সেইজন্যই প্রবৃত্তি আদি দমন বা তাকে সুচারুরূপে চালনা করাও সম্পূর্ণ নিজের হাতে।

প্রশ্ন। সব কর্ম্মের ফল হলেও, গোড়া ত একটা আছে! সেই গোড়াতেই বা আমাদের প্রবৃত্তির ভালমন্দ হয় কেন?

স্বামীজী। কে বললে গোড়া আছে? সৃষ্টি যে অনাদি। বেদের এই মত। ভগবান যতদিন আছেন, তাঁর সৃষ্টিও ততদিন আছে।

আর একজন প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা মশায়, মায়াটা কেন এল? আর কোথা থেকে এল?

স্বামীজী। ভগবান সম্বন্ধে কেন বলাটা ভুল। কেন বলা যায় কার সম্বন্ধে?—যার অভাব আছে, তারই সম্বন্ধে। যার কোন অভাব নেই, যে পূর্ণ, তার পক্ষে কেন কি? 'মায়া কোথা থেকে এল?'—এরূপ প্রশ্নই হতে পারে না। দেশ, কাল, নিমিত্তের নামই মায়া। তুমি আমি সকলেই এই মায়ার ভিতর। তুমি প্রশ্ন করছ ঐ মায়ার পারের জিনিস সম্বন্ধে। মায়ার ভিতর থেকে মায়ার পারের জিনিসের কি কোন প্রশ্ন হতে পারে?

অতঃপর অন্য দুই-চারিটা কথার পর সভা ভঙ্গ হইল। আমরাও সকলে আপন আপন বাসায় ফিরিলাম।

* * *

২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৮ সাল। ১২ই মাঘ, সোমবার। গত শনিবার যে লোকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি আবার আসিয়াছেন।

তিনি intermarriage (অন্তর্বিবাহ) সম্বন্ধে আবার কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "ভিন্ন জাতির সহিত আমাদের কিরূপে আদান-প্রদান হতে পারে ?"

স্বামীজী। বিধর্ম্মী জাতিদের ভিতর আদান-প্রদান হবার কথা আমি বলি না। অন্ততঃ আপাততঃ উহা সমাজ-বন্ধনকে শিথিল করে নানা উপদ্রবের কারণ হবে, এ কথা নিশ্চিত। জান ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নং' ইত্যাদি—(গীতা)। সধর্ম্মীদের মধ্যেই বিবাহ-প্রচলনের কথা আমি বলে থাকি।

প্রশ্ন। তা হলেও ত অনেক গোল। মনে করুন আমার এক মেয়ে আছে, সে এদেশে জন্মেছে ও পালিত হয়েছে। মনে করুন তার বিয়ে দিলুম এক পশ্চিমে মেড়ুয়ার সঙ্গে বা মান্দ্রাজীর সঙ্গে। বিয়ের পর মেয়েও জামাইয়ের কথা বোঝে না, জামাইও মেয়ের কথা বোঝে না। আবার পরস্পরের দৈনিক ব্যবহারাদিরও অনেক তফাৎ। বর-কনের সম্বন্ধে ত এই গণ্ডগোল। আবার সমাজেও মহা বিশৃঙ্খলা এসে পড়বে।

স্বামীজী। ওরকম ধরণের বিয়ে হতে আমাদের দেশে এখনও ঢের দেরী। একেবারে ওরকম করাও ঠিক নয়। কাজের একটা secret (রহস্য) হচ্চে to go by the way of least possible resistance (যতদূর সম্ভব কম বাধার পথে চলা)। সেইজন্য প্রথমে এক বর্ণের মধ্যে বিয়ে চলুক। এই বাঙ্গালা দেশের কায়স্থদের কথা ধর। এখানে কায়স্থদের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে—উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ইত্যাদি। এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই। প্রথমে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক্। যদি তা সম্ভব না হয়, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক্। এইরূপে যেটা আছে, সেটাকেই গড়তে হবে—ভাঙ্গার নাম সংস্কার নয়।

প্রশ্ন। আচ্ছা না হয় বিয়েই হল, তাতে ফল কি? উপকার কি?

স্বামীজী। দেখতে পাচ্চ না, আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশ' বছর ধরে বিয়ে হয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হ'তে আরম্ভ হয়েছে। তাতেই শরীর দুর্ব্বল হয়ে যাচ্চে, সেই সঙ্গে যত রোগ আদিও এসে জুটছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভিতরেই রক্তটা চলাফেরা করে দূষিত হয়ে পড়েছে। তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাত সকল বালকেই নিয়ে জন্মাচ্ছে। সেইজন্য তাদের শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ। কাজেই কোন রোগের বীজকে resist করবার (বাধা দিবার) ক্ষমতা ওসব শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে। শরীরের মধ্যে একবার নূতন অন্যরকম রক্ত বিবাহের দ্বারা এসে পড়লে এখনকার রোগাদির হাত থেকে ছেলেগুলো পরিত্রাণ পাবে ও এখনকার চাইতে ঢের active (কর্ম্মঠ) হবে।

প্রশ্ন। আচ্ছা মশায়, early marriage (বাল্যবিবাহ) সম্বন্ধে আপনার মত কি?

স্বামীজী। বাঙ্গালাদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ছেলেদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার নিয়মটা উঠে গিয়েছে। মেয়েদের মধ্যেও পূর্ব্বের চেয়ে দুই-এক বছর বেশী বড় করে বিয়ে দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সেটা হয়েছে টাকার দায়ে। তা যেজন্যই হোক্, মেয়েগুলোর আরও বড় করে বিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বাপ-বেচারীরা কি করবে? মেয়ে বড় হলেই বাড়ীর গিন্নি থেকে আরম্ভ করে যত আত্মীয়ারা ও পাড়ার মেয়েরা বে দেবার জন্য নাকে কান্না ধরবে। আর তোমাদের ধর্ম্মধ্বজীদের কথা বলে আর কি হবে! তাদের কথা ত আর কেহ মানে না, তবুও তারা আপনারাই মোড়ল সাজে। রাজা বললে যে, বার বৎসরের মেয়ের সহবাস করতে পারবে না, অমনি

দেশের সব ধর্ম্মধ্বজীরা 'ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল' বলে চীৎকার আরম্ভ করলো। বার-তের বছরের বালিকার গর্ভ না হলে তাদের ধর্ম্ম হবে না! রাজাও মনে করেন, বা রে এদের ধর্ম্ম! এরাই আবার political agitation (রাজনৈতিক আন্দোলন) করে, political right (রাষ্ট্রীয় অধিকার) চায়।

প্রশ্ন। তা'হলে আপনার মত যে, মেয়ে-পুরুষ সকলেরই বেশী বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত।

স্বামীজী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তা না হ'লে অনাচার ব্যভিচার আরম্ভ হবে। তবে যেরকম শিক্ষা চলেছে, সে-রকম নয়। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখা চাই। খালি বইপড়া শিক্ষা হলে হবে না। যাতে character form (চরিত্র তৈরী) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই।

প্রশ্ন। মেয়েদের মধ্যে অনেক সংস্কার দরকার।

স্বামীজী। ঐরকম শিক্ষা পেলে, মেয়েদের problems (সমস্যাগুলো) মেয়েরা আপনারাই solve (মীমাংসা) করবে। আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে আস্‌ছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাদের মধ্যে self-defence (আত্মরক্ষা) শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দিখিন্ ঝাঁন্সির (Jhansi) রাণী কেমন ছিল!

প্রশ্ন। আপনি যা বলছেন তা বড়ই নূতন ধরণের, আমাদের মেয়েদের মধ্যে সে শিক্ষা দিতে এখনও সময় লাগবে।

স্বামীজী। চেষ্টা করতে হবে। তাদের শেখাতে হবে। নিজেদেরও শিখতে হবে। খালি বাপ হলেই ত হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে করতে

হয়। আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষাও ত সহজে দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুর মেয়ে সতীত্ব কি জিনিস, তা তারা সহজেই বুঝতে পারবে; এটা তাদের heritage (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জিনিস) কিনা। প্রথমে সেই ভাবটাই বেশ করে তাদের মধ্যে উস্কে দিয়ে তাদের character form (চরিত্র তৈরী) করতে হবে—যাতে তারা বিবাহ হোক্ বা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোন-একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব? এখন যেরকম সময় পড়েছে, তাতে তাঁদের ঐ যে ভাবটা বহুকাল থেকে আছে, তার বলেই তাদের মধ্যে কতকগুলিকে চিরকুমারী করে রেখে ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাতে তাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হতে পারে, তাও শেখাতে হবে; তা হলে তারা অতি সহজেই ঐসব শিখতে পার্‌বে ও ঐরূপ শিখতে আমোদও পাবে। আমাদের দেশে যথার্থ কল্যাণের জন্য এইরকম কতকগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হওয়া দরকার হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন। ঐরূপ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হলেও দেশের কল্যাণ কেমন করে হবে?

স্বামীজী। তাদের দেখে ও তাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উল্টে যাবে। এখন ধরে বিয়ে দিতে পার্‌লেই হল! —তা নয় বছরেই হোক, দশ বছরেই হোক! এখন এরকম হয়ে পড়েছে যে, তের বছরের মেয়ের সন্তান হলে গুষ্টিশুদ্ধর আহ্লাদ কত, তার ধুমধামই বা দেখে কে! এ ভাবটা উল্টে গেলে ক্রমশঃ দেশে শ্রদ্ধাও আসতে পারবে। যারা ঐরকম ব্রহ্মচর্য্য করবে, তাদের ত কথাই নেই—কতটা শ্রদ্ধা, কতটা নিজেদের উপর বিশ্বাস তাদের হবে, তা বলা যায় না।

শ্রোতা মহাশয় এতক্ষণ পরে স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীজী বলিলেন, "মাঝে মাঝে এস।" তিনি বলিলেন, "ঢের উপকার পেলুম; অনেক নূতন কথা শুনলুম, এমন আর কখনও কোথাও শুনি নি।" সকাল হইতে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এখন বেলা হইয়াছে দেখিয়া আমিও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

স্নান-আহারাদি ও একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বাগবাজারে চলিলাম। আসিয়া দেখি, স্বামীজীর কাছে অনেক লোক। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হইতেছে। হাসি-তামাসাও চলিতেছে। একজন বলিয়া উঠিলেন, "মহাপ্রভুর কথা নিয়ে এত রঙ্গরসের কারণ কি? আপনারা কি মনে করেন, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন না, তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করেন নাই?"

স্বামীজী। কে বাবা তুমি? কাকে নিয়ে ফষ্টিনাষ্টি করতে হবে? তোমাকে নিয়ে নাকি? মহাপ্রভুকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করাটাই দেখছ বুঝি? তাঁর কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের জলন্ত আদর্শ নিয়ে এতদিন যে জীবনটা গড়বার ও লোকের ভিতর সেই ভাবটা ঢোকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটা দেখতে পাচ্ছ না। শ্রীচৈতন্যদেব মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও থাক্‌তেন না। কিন্তু পরে চেলারা তাঁর নাম করে নেড়া-নেড়ীর দল করলে। আর তিনি যে প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন, তা স্বার্থশূন্য কামগন্ধহীন প্রেম। তা কখন সাধারণের সম্পত্তি হতে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব গুরুরা আগে তাঁর ত্যাগটা শেখানোর দিকে ঝোঁক না দিয়ে তাঁর প্রেমটাকে সাধারণের ভিতর ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কাজেই সাধারণ লোকে সে উচ্চ প্রেমভাবটা নিতে পারলে না ও সেটাকে নায়ক-নায়িকার দূষিত প্রেম করে তুল্‌লে।

প্রশ্ন। মশায়, তিনি ত আচণ্ডালে হরিনাম প্রচার করলেন, তা সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজী। প্রচারের কথা হচ্ছে না গো, তাঁর ভাবের কথা হচ্ছে—প্রেম প্রেম—রাধাপ্রেম। যা নিয়ে তিনি দিন রাত মেতে থাকতেন—তার কথা হচ্ছে।

প্রশ্ন। সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজী। সাধারণের সম্পত্তি কি করে হয়, তা এই জাতটা দেখে বোঝ না? ওই প্রেম প্রচার করেই ত সমস্ত জাতটা মাগী হয়ে গিয়েছে। সমস্ত উড়িষ্যাটা কাপুরুষ ও ভীরুর আবাস হয়ে গিয়েছে। আর এই বাঙ্গালা দেশটায় চারশ' বছর ধরে রাধাপ্রেম করে কি দাঁড়িয়েছে দেখ! এখানেও পুরুষত্বের ভাব প্রায় লোপ হয়েছে। লোকগুলো কেবল কাঁদতেই মজবুত হয়েছে। ভাষাতেই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—তা চারশ' বছর ধরে বাঙ্গালা ভাষায় যা কিছু লেখা হয়েছে, সে-সব এক কান্নার সুর। প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কিছুই নাই। একটা বীরত্বসূচক কবিতাও জন্ম দিতে পারে নি!!

প্রশ্ন। ওই প্রেমের অধিকারী তবে কারা হতে পারে?

স্বামীজী। কাম থাকতে প্রেম হয় না—এক বিন্দু থাকতেও হয় না। মহাত্যাগী, মহাবীর পুরুষ ভিন্ন ও-প্রেমের অধিকারী কেউ নয়। ওই প্রেম সাধারণের সম্পত্তি করতে গেলে নিজেদের এখনকার ভিতরকার ভাবটাই ঠেলে উঠবে। ভগবানের উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের গিন্নিদের সঙ্গে প্রেমের কথাই মনে উঠ্‌বে। আর প্রেমের যে অবস্থা হবে তা ত দেখতেই পাচ্চ!

প্রশ্ন। তবে কি ঐ প্রেমের পথ দিয়ে ভজন করে—ভগবানকে স্বামী

ও আপনাকে স্ত্রী ভেবে ভজন করে—তাঁহাকে (ভগবানকে) লাভ করা গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব ?

স্বামীজী। দু-এক জনের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে যে অসম্ভব, একথা নিশ্চিত। আর এ কথা জিজ্ঞাসারই বা এত আবশ্যক কি ? মধুরভাব ছাড়া ভগবানকে ভজন করবার আর কি কোন পথ নেই ? আর চারটে ভাব আছে ত, সেগুলো ধরে ভজন কর না ? প্রাণভরে তাঁর নাম কর না ? হৃদয় খুলে যাবে। তার পরে যা হবার আপনি হবে। তবে একথা নিশ্চিত জেন যে, কাম থাকতে প্রেম হয় না। কামশূন্য হবার চেষ্টাটাই আগে কর না। বল্‌বে, তা কি করে হবে ?—আমি গৃহস্থ। গৃহস্থ হলেই কি কামের একটা জালা হতে হবে ? স্ত্রীর সঙ্গে কামজ সম্বন্ধ রাখতেই হবে ? আর মধুরভাবের উপরই বা এত ঝোঁক কেন ? পুরুষ হয়ে মাগীর ভাব নেবার দরকার কি ?

প্রশ্ন। হাঁ, নামকীর্ত্তনটাও বেশ। সেটা লাগেও বেশ, শাস্ত্রেও কীর্ত্তনের কথা আছে। চৈতন্যদেবও তাই প্রচার কর্‌লেন। যখন খোলটা বেজে উঠে, তখন প্রাণটা যেন মেতে উঠে আর নাচতে ইচ্ছে করে।

স্বামীজী। বেশ কথা, কিন্তু কীর্ত্তন মানে কেবল নাচাই মনে কর না। কীর্ত্তন মানে ভগবানের গুণগান, তা যেমন করেই হোক। বৈষ্ণবদের মাতামাতি ও নাচ ভাল বটে, কিন্তু তাতেও একটা দোষ আছে। সেটা থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে যেও। কি দোষ জান ? প্রথমে একেবারে ভাবটা খুব জমে, চোখ দিয়ে জল বেরোয়, মাথাটাও রিরি করে, তারপর যেই সংকীর্ত্তন থামে তখন সে ভাবটা হু হু করে নাবতে থাকে। যত উঁচু ঢেউ উঠে, নাববার সময় সেটা তত নীচুতে নাবে। বিচারবুদ্ধি

সঙ্গে না থাকলেই সর্ব্বনাশ—সে সময়ে রক্ষা পাওয়া ভার। কামাদি নীচ ভাবের অধীন হয়ে পড়তে হয়। আমেরিকাতেও ওইরূপ দেখেছি, কতকগুলো লোক গির্জ্জায় গিয়ে বেশ প্রার্থনা কর্‌লে, ভাবের সঙ্গে গাইলে, লেকচার শুনে কেঁদে ফেল্‌লে—তারপর গির্জ্জা থেকে বেরিয়েই বেশ্যালয়ে ঢুক্‌ল।

প্রশ্ন। তা হলে মহাশয়, চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রচলিত ভাবগুলির ভিতর কোন্‌গুলি নিলে আমাদের কোনরূপ ভ্রমে পড়তে হবে না এবং মঙ্গলও হবে?

স্বামীজী। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে ডাক্‌বে। ভক্তির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি রাখবে। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের কাছ থেকে আরও নেবে তাঁর heart (হৃদয়বত্তা), সর্ব্বজীবে ভালবাসা, ভগবানের জন্য টান, আর তাঁর ত্যাগটা জীবনের আদর্শ করবে।

প্রশ্ন। (স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়া) ঠিক বলেছেন, মহাশয়। আমি আপনার ভাব প্রথমে বুঝতে পারি নি। (করজোড়ে) মাপ করবেন। তাই আপনাকে বৈষ্ণবদের মধুরভাব নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কর্‌তে দেখে কেমন বোধ হয়েছিল।

স্বামীজী। (হাসিতে হাসিতে) দেখ, গালাগাল যদি দিতেই হয় ত ভগবানকে দেওয়াই ভাল। তুমি যদি আমাকে গাল দাও, আমি তেড়ে যাব। আমি তোমাকে গাল দিলে তুমিও তার শোধ তোল্‌বার চেষ্টা করবে। ভগবান ত সে-সব পার্‌বেন না।

এইবার প্রশ্নকর্ত্তা তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন। বলিয়াছি, স্বামীজী কলিকাতায় থাকিলে নিত্যই এইরূপ লোকের ভিড় হইত। তাঁহার নিকট এইরূপ লোকসমাগম পরে আর কখনও দেখি নাই। লোকের বিরাম নাই। সকাল হইতে রাত্রি আটটা-নয়টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত

লোকের যাওয়া-আসা হইত। খাওয়া-দাওয়াও বড় অসময়ে হইত। সেইজন্য অনেকে জনতা বন্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন। একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময় কাহারও সঙ্গে দেখা করিবেন না, এইরূপ করিবার জন্য স্বামীজীকে অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু চির-পরহিতাকাঙ্ক্ষী স্বামীজীর প্রেমিক হৃদয় জনসাধারণের এইরূপ ধর্ম্মপিপাসা দেখিয়া একেবারে গলিয়া গিয়াছিল,—তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও জনতারোধ সম্বন্ধে কাহারও কথা তিনি রাখিলেন না। বলিলেন, "তারা এত কষ্ট করে দূর থেকে হেঁটে আস্‌তে পারে আর আমি এখানে বসে বসে একটু নিজের শরীর খারাপ হবে বলে তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারি নি?"

অতঃপর আর কোন কথা হইল না। সভা ভাঙ্গিয়া গেল। দুই-চারি জন লোক ভিন্ন আর কেহ রহিল না। এখন বেলা তিন-চারিটা হইবে। স্বামীজীর সহিত অন্য কথাবার্ত্তা উপস্থিত কয়েকজনের সঙ্গে হইতে লাগিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার কথাও হইতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলিলেন, "ইংলণ্ড হইতে আস্‌বার সময় পথে বড় এক মজার স্বপ্ন দেখেছিলুম। ভূমধ্যসাগরে আস্‌তে আস্‌তে জাহাজে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখি—বুড়ো থুড়থুড়ে ঋষিভাবাপন্ন একজন লোক আমাকে বল্‌ছে,—'তোমরা এস, আমাদের পুনরুদ্ধার কর, আমরা হচ্চি সেই পুরাতন থেরাপুত্ত-সম্প্রদায়—ভারতের ঋষিদের ভাব লইয়াই যাহা গঠিত হইয়াছে। খ্রীষ্টানেরা আমাদের প্রচারিত ভাব ও সত্যসমূহই যীশুর দ্বারা প্রচারিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। নতুবা যীশু নামে বাস্তবিক কোন ব্যক্তি ছিল না। ওই-বিষয়ক নানা প্রমাণাদি এই স্থান খনন করিলে পাওয়া যাইবে।' আমি বললাম, 'কোথায় খনন করিলে ঐসকল প্রমাণ-চিহ্নাদি পাওয়া

যাইতে পারে?' বৃদ্ধ বলিল, 'এই দেখ না এইখানে', বলিয়া টর্কির নিকটবর্ত্তী একটি স্থান দেখাইয়া দিল। অতঃপর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র তাড়াতাড়ি উপরে যাইয়া কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখন জাহাজ কোন্ স্থানের নিকট উপস্থিত হইয়াছে?' কাপ্তেন বলিল, 'ওই সম্মুখে টর্কি এবং ক্রীটদ্বীপ দেখা যাইতেছে।'" গল্প বলিয়াই স্বামীজী হাসিতে লাগিলেন, স্বপ্ন কি না! অতঃপর আমি স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি

১৮৯৫ সনের ২০শে জানুয়ারী আমি আমার ভগিনীর সঙ্গে নিউইয়র্কের ৫৪ পশ্চিম ৩৩নং ষ্ট্রীটে যাই। সেই বাড়ীর বৈঠকখানায় স্বামী বিবেকানন্দের কথা প্রথম শুনি। ১৫।২০ জন ভদ্রমহিলা এবং দু-তিন জন ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘরটি ছিল জনাকীর্ণ। ঘরের সব আরাম-কেদারা সরান হয়েছিল, সেইজন্ত আমি মেজের প্রথম সারিতে বসলাম। স্বামীজী কোণে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি একটা কিছু বলেছিলেন, ঠিক কথাগুলি আমার মনে নেই; তবে সঙ্গে সঙ্গেই তা' আমার নিকট সত্য বলে প্রতিভাত হ'ল। তাঁর দ্বিতীয় কথাটি, তাঁর তৃতীয় কথাটিও সত্য মনে হয়েছিল। এভাবে আমি সাত বছর তাঁর বাণী শুনেছিলাম। যা' কিছু তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তা-ই আমার নিকট সত্য। তখন হতেই আমার কাছে জীবনের অর্থ হ'ল অন্ত রকম। তিনি যেন আমাকে অনুভব করালেন—তুমি অনন্তে বিরাজমান। এই অনন্ত ত বদলায় না, এর ত বৃদ্ধি নেই। এ সূর্য্যের মত; একবার অনুভব করলে একে তুমি কখনও ভুলবে না।

সেই সারা শীতকাল আমি তাঁর উপদেশ-বাণী শুনেছিলাম—সপ্তাহে তিন দিন, সকাল এগারটায়। আমি কখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলি নি, কিন্তু আমরা এত নিয়মিত ভাবে আসতাম যে স্বামীজীর ঐ বসবার ঘরে সব সময়েই আমাদের জন্ত সামনে দুটি আসন থাকত।

একদিন আমাদের দিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "তোমরা কি বোন?" "হ্যাঁ"—আমরা উত্তর করিলাম। তিনি আবার জিজ্ঞেস্

করলেন, "তোমরা কি অনেক দূর থেকে আস?" "না বেশী নয়—হাডসনের ৩০ মাইল উজানে এসেছি।" "এত দূর? আশ্চর্য্যের বিষয়!" তাঁর সঙ্গে আমার ঐ প্রথম কথা।

আমি তখন মনে করতাম অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বিবেকানন্দের পরেই মিসেস্ রোয়েথলিস বার্জারের স্থান। এই ভদ্রমহিলাই আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে যান। স্বামীজীর কাছে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। একদিন মিসেস্ বার্জার ও আমি স্বামীজীর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস্ করলাম, "স্বামীজী, কি রকমে ধ্যান করতে হয় আমাদের শেখাবেন কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "এক সপ্তাহ 'ওম্' ধ্যান করে আমার নিকট এসো।" এক সপ্তাহ পরে আমরা আবার গেলাম। মিসেস্ রোয়েথলিস বার্জার বললেন, "আমি একটি জ্যোতি দেখি।" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "ভাল কথা, লেগে থাক।" "হৃদয়ের মধ্যে একটা কিছু জ্যোতির মত দেখি—" মিসেস্ বার্জার বলিলেন। "বেশ ত, লেগে থাক।"

স্বামীজী ঐ মাত্রই শিখিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগে আমরা ধ্যান অভ্যাস করছিলাম, আর গীতাও পড়েছিলাম। আমার মনে হয় তা' আমাদের স্বামীজীরূপ মহাশক্তিকে চিন্‌তে সাহায্য করেছিল। আমার বিশ্বাস অন্যকে সাহসদানেই ছিল তাঁর শক্তি। তাঁকে নিজ সম্বন্ধে একেবারেই সজাগ মনে হ'ত না। অন্যের প্রতিই ছিল তাঁর দৃষ্টি। তিনি বলতেন, "যখনই জীবনের বইখানি খুলতে আরম্ভ করে, তখনই তামাসা শুরু হয়।" আরও বলতেন, জীবনে অনাধ্যাত্মিক পার্থিবভাবাপন্ন কিছুই নেই; সবই পূত, আধ্যাত্মিক। "সব সময়েই মনে করবে দৈবাৎ তুমি আমেরিকাবাসী—একজন স্ত্রীলোক, কিন্তু সর্ব্বদাই অপরিবর্ত্তনীয়রূপে তুমি ভগবানের সন্তান। দিনরাত নিজেকে বল তুমি কে—তোমার স্বরূপ কি

কখনও ভুলে যেয়ো না।" এ কথাই তিনি আমাদের শেখাতেন। তাঁর উপস্থিতি ছিল সক্রিয় ও উদ্দীপক! এ শক্তি যদি তোমার না থাকে তবে এটা তুমি অন্যে সঞ্চারণ করতে পারবে না, টাকা না থাকলে যেমন অন্যকে দান করতে পার না। তুমি তা' কল্পনা করতে পার, কাজে দেখাতে পার না।

আমরা কখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলতাম না, তাঁর সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছু করবারও ছিল না। সেই বছর বসন্তের এক রাত্রিতে আমরা মিঃ ফ্রান্সিস্ এইচ্. লেগেট-এর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। মিঃ লেগেট পরে আমার ভগ্নীপতি হন। আমরা তাঁকে বল্লাম, "আমরা আপনার সঙ্গে খেতে পারি বটে, কিন্তু এই অপরাহ্ণ আপনার বাড়ীতে কাটাতে পারি না।" তিনি উত্তর দিলেন, "খুব ভাল কথা, আমার সঙ্গে কেবল আহারই করুন।" খাওয়া শেষ হ'লে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই বিকেলে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?" বললাম, "আমরা এক বক্তৃতা শুন্তে যাচ্ছি।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি আস্তে পারি?" আমরা বললাম, "হাঁ।" তিনি এলেন, বক্তৃতাও শুনলেন। বক্তৃতা শেষ হলে মিঃ লেগেট স্বামীজীর নিকট গিয়ে তাঁর করমর্দ্দন করে বললেন, "স্বামীজী, আমার সঙ্গে কবে আপনি আহার করবেন?" ইনিই আমাদিগকে সামাজিকভাবে স্বামীজীর নিকট পরিচিত করিয়ে দেন।

ক্যাট্‌স্‌কিল পর্ব্বতের রিজ্‌লি ম্যানর মিঃ লেগেটের বাসস্থান। এখানে এসে স্বামীজী কয়েক দিন ছিলেন। স্বামীজীর কয়েকজন ছাত্র বললেন, "স্বামীজী, আপনি কিন্তু যেতে পারবেন না। ক্লাসগুলো চল্‌ছে।" স্বামীজী অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "এগুলো কি আমার

ক্লাস? আমি যাবই।” তিনি সত্যই চলে গেলেন। সেখানে থাকা-কালে আমার বোনের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হয়েছিল। তাদের তখন বার ও চৌদ্দ বছর বয়স। স্বামীজীর নিউইয়র্কে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসগুলো যখন আবার আরম্ভ হয়ে গেল, তখন তাদের কথা তাঁর মনে ছিল বলে বোধ হল না। তারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, “আমাদের কথা স্বামীজীর মনে নেই!” আমরা তাদের সান্ত্বনা দিলাম, “ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।”

যখনই স্বামীজী বক্তৃতা দিতেন, তখনই তিনি তাঁর বক্তৃতার বিষয়ে পুরোপুরি ডুবে যেতেন। বক্তৃতার শেষে তিনি ছেলেমেয়েদের কাছে এসে বললেন, “তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় আমার খুব আনন্দ হ'ল!” তা' হলে তাদের কথা তাঁর মনে ছিল! তারাও খুব খুশী হয়ে গেল।

সম্ভবতঃ ঐ সময়ে তিনি নিউইয়র্কে আমাদের অতিথি ছিলেন। এক দিন তিনি বেশ স্থির ধীর প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বাড়ী ফিরলেন। কয়েকঘণ্টা কোন কথা বলেন নি; শেষে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “স্বামীজী, আজ আপনি কি করলেন?” তিনি বললেন, “আজ আমি এমন একটি জিনিস দেখেছি যা কেবল আমেরিকায়ই সম্ভব। আমি বাসে ছিলাম; হেলেন গোল্ড্ এক পাশে বসেছেন, আর এক পাশে বসেছে একটি নিগ্রো ধোপানী—কোলে তার ধোয়া জামা কাপড়। আমেরিকা ছাড়া কোন দেশ এ দৃশ্য দেখাতে পারে না!”

ঐ বছরের জুন মাসে স্বামীজী ক্রিশ্চিন লেকের ক্যাম্প পার্সিতে যান। ওখানে তিনি মিঃ লেগেটের মাছ ধরবার ক্যাম্পে অতিথি হন। আমরাও গিয়েছিলাম। সেখানে মিঃ লেগেটের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে স্থির হ'ল; স্বামীজীকে বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়।

তিনি যে কটা দিন ক্যাম্পে ছিলেন সাদা সুন্দর বার্চ গাছের নীচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতেন। আমাদের কিছু না বলে স্বামীজী বার্চ গাছের ছাল দিয়ে (ভূর্জ্জপত্রে) দু'খানি সুন্দর বই তৈরী করে তাতে সংস্কৃত ও ইংরেজীতে কিছু লিখে ফেললেন। বই দু'খানি দিয়েছিলেন আমাকে আর আমার বোনকে।

তারপর আমার বোন এবং আমি যখন বিয়ের পোশাক কিনতে প্যারিস্ গেলাম, তখন স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে যান। সেখানে দেড়মাস কাল তিনি তাঁর চমকপ্রদ উদ্দীপনাময় উপদেশবাণী প্রদান করেন যা 'Inspired Talks' ('দেববাণী') নামে অভিহিত। আমার কাছে ঐ কথাগুলি সবচেয়ে সুন্দর! একদল অন্তরঙ্গ শিষ্যদের উদ্দেশে তা' প্রদত্ত হয়েছিল। তাঁরা স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন, আমি কিন্তু কখনও তাঁর বন্ধু ছাড়া কিছুই ছিলাম না। আমার মনে হয়, কিছুই তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তল তেমন উদ্ঘাটিত করে নি, ঐ অবিস্মরণীয় দিনগুলি যেমন করেছিল!

তিনি আগষ্ট মাসে মিঃ লেগেটের সঙ্গে প্যারিস আসেন। সেখানে আমার বোন ও আমি 'হোল্যাণ্ড হাউসে' ছিলাম। স্বামীজী ও মিঃ লেগেট অন্য হোটেলে থাকতেন। অবশ্য আমরা প্রতিদিনই তাঁদের দেখা পেতাম। মিঃ লেগেটের একটি পিয়ন ছিল। সে সব সময়েই স্বামীজীকে বলত 'আমার রাজা'! স্বামীজী বলতেন, "কিন্তু আমি ত রাজা নই, আমি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী।" পিয়নটি উত্তর দিত, "আপনি তা বলতে পারেন বটে, কিন্তু আমি রাজ-রাজড়াদের সঙ্গে চলে অভ্যস্ত। কাউকে দেখেই আমি বুঝতে পারি ইনি সত্যই কি।" স্বামীজীর তেজোদ্দীপ্ত ভাব প্রত্যেককেই আকৃষ্ট করত। একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, "স্বামীজী, আপনি এত রাজোচিত মহত্ত্বপূর্ণ!" তিনি উত্তর করলেন, "না, আমি নই, আমার হাঁটার ধরণ।"

৯ই সেপ্টেম্বর মিঃ এবং মিসেস লেগেটের বিয়ে হয়। পরদিন স্বামীজী লণ্ডন রওনা হন। লণ্ডনে স্বামীজী মিঃ ই. টি. ষ্টার্ডির অতিথি হন। এর আগেই মিঃ ষ্টার্ডি ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্যের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি। ওখানে থাকার কিছু দিন পরেই স্বামীজী আমাদের চিঠি লিখেন, "এখানে চলে এসে ক্লাসগুলোতে যোগ দাও।" আমরা যখন গেলাম, তখন তিনি কিছু দিন ধরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি প্রিন্সেস হল-এ বক্তৃতা দিয়ে বাগ্মিতার পরিচয় দেন। পরদিন সংবাদপত্রগুলি খবরে ভরে গেল— "একজন বিশিষ্ট ভারতীয় যোগী লণ্ডনে এসেছেন" ইত্যাদি। সেখানে তিনি অত্যন্ত সম্মান লাভ করেছিলেন। ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমরা লণ্ডনে ছিলাম। তারপর স্বামীজী আমেরিকায় চলে এলেন ওখানে তাঁর কাজ চালাবার জন্য। পরের বছরের এপ্রিল মাসে তিনি আবার ফিরে যান। ঐ সময় তিনি ক্লাস নিতে লাগলেন এবং সত্যিকার সুনির্দ্দিষ্ট কাজ আরম্ভ করলেন ১৮৯৬ সনে। জুলাই মাস পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রীষ্মকালে তিনি ওখানে কাজ চালান। তারপর চলে যান সুইট্জারল্যাণ্ড, সেভিয়ারদের সঙ্গে।

স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, অতি বিস্ময়কর! একবার আমার বোনঝি য়্যালবার্টা ষ্টারজেস্—পরবর্ত্তী কালে লেডি স্যাণ্ডুইচ্— স্বামীজীর সঙ্গে রোমে যায়। য়্যালবার্টা তাঁকে রোমের দর্শনীয় সব দেখাচ্ছিল। বড় বড় স্মৃতিস্তম্ভগুলির অবস্থান সম্বন্ধে স্বামীজীর জ্ঞান দেখে সে অবাক হয়ে গেল। সে তাঁর সঙ্গে সেণ্ট পিটার্স-এ গেল। সেখানে রোমের গীর্জার প্রতীকগুলির প্রতি, মণিমাণিক্যের প্রতি, সাধুসন্তদের সুন্দর পোশাক প্রভৃতির প্রতি স্বামীজীর অভাবনীয় সশ্রদ্ধ ভাব দেখে সে

আরও অবাক হয়ে গেল। সে বলল, "স্বামীজী, আপনি ত সগুণ সবিশেষ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন; তাহ'লে এসবকে এত সম্মান দিচ্ছেন কেন?" তিনি উত্তর করলেন, "কিন্তু য়্যালবার্টা, তুমি যদি সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে থাক, তা হ'লে ত এতে তোমার অন্তরের সবটুকু ভক্তিই দিতে হবে।"

সেই বৎসর শরৎকালে স্বামীজী মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার এবং জে. জে. গুড্‌উইন-এর সঙ্গে সুইটজারল্যাণ্ড্‌ থেকে ভারতবর্ষ যাত্রা করেন। সেখানে সমগ্রজাতির সাগ্রহ অভিনন্দন তাঁর প্রতীক্ষায় উন্মুখ ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত জানা যেতে পারে 'Lectures from Colombo to Almora' নামক বই-এ।[১] মিঃ গুড্‌উইন তাঁর অনুলেখক ছিলেন। ৫৪ পশ্চিম ৩৩নং ষ্ট্রীটে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের সব বক্তৃতার অনুলেখনের জন্য। মিঃ গুড্‌উইন বিচারালয়ের অনুলেখক ছিলেন—প্রতি মিনিটে তিনি দু'শ শব্দ লিখতে পারতেন। সেইজন্যই তাঁর পারিশ্রমিকও ছিল অত্যন্ত বেশী। তবুও স্বামী বিবেকানন্দের কোন কথাই আমরা হারাতে চাই নি বলে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলাম। প্রথম সপ্তাহের পর মিঃ গুডউইন আর কোন পারিশ্রমিক নিলেন না। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "এর মানে কি মিঃ গুডউইন?" তিনি বললেন, "বিবেকানন্দ যদি তাঁর জীবন দিতে পারেন, আমি অন্ততঃ আমার সেবাটুকু দিতে পারি।" তিনি সমগ্র পৃথিবী ঘুরেছেন স্বামীজীর অনুবর্ত্তী হিসেবে। সাত খণ্ড বই-এ আমরা পেয়েছি স্বামীজীর মুখ-নিঃসৃত বাণী। মিঃ গুডউইনই তা লিখে নিয়েছিলেন।

স্বামীজীর ভারতবর্ষে চলে যাবার পর আমি তাঁর কাছে চিঠি লিখি নি। প্রতীক্ষা করছিলাম, তিনি নিশ্চয় লিখবেন। শেষে একটি

[১] 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

চিঠি পেলাম, তাতে লিখেছেন, "তুমি চিঠি লেখ না কেন?" আমি উত্তর দিলাম, "আমি কি ভারতবর্ষে আসব?" তিনি লিখলেন, "হাঁ, দুঃখ, দুর্গতি, দারিদ্র্য, নোংরা আবর্জনা; নেংটিপরা লোক ধর্ম্মের কথা বলছে—এসব সত্ত্বেও যদি আসতে চাও, তবে এসো। অন্য কিছু যদি চেয়ে থাক তা হ'লে এস না। বিরুদ্ধ সমালোচনা আর আমরা সহ্য করতে পারি না।" প্রথম জাহাজেই আমি রওনা হলাম। ১২ই জানুয়ারী মিসেস্ ওলি বুল ও স্বামী সারদানন্দের সহিত আমি যাত্রা করি। পথে আমরা লণ্ডনে নেবেছিলাম, সেখান থেকে সোজা রোমে এলাম। ১২ই ফেব্রুয়ারী আমরা বম্বে পৌঁছি। সেখানে মিঃ আলাসিঙ্গা আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর কপালে ছিল বৈষ্ণবের সোজা লাল তিলক। একবার কাশ্মীর যাওয়ার পথে স্বামীজীকে প্রসঙ্গতঃ বললাম, "মিঃ আলাসিঙ্গা দেখছি কপালে বৈষ্ণবের ফোঁটা তিলক কাটেন।" বলামাত্রই স্বামীজী আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে অত্যন্ত তীব্রস্বরে বললেন, "তোমাদের কিছু বলতে হবে না। তোমরা এতদিন কি করেছ?" আমি কি অন্যায় করেছিলাম তা' আমি তখন বুঝতে পারি নি। অবশ্য আমি কোন উত্তর দিই নি। আমার চোখে জল এল, আমি বসে রইলাম। পরে জানতে পেলাম মিঃ আলাসিঙ্গা পেরুমল একজন ব্রাহ্মণ যুবক। মাদ্রাজের কোন কলেজে তিনি দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর মাইনে ১০০৲; তা' দিয়েই পিতামাতা স্ত্রী এবং চারটি শিশুসন্তানের ভরণপোষণ করতেন। বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্ত্যদেশে পাঠাতে তিনিই টাকার জন্য দ্বারে দ্বারে যান। সম্ভবতঃ উনি না হ'লে আমাদের কখনও বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হ'ত না। তখন বুঝা গেল আলসিঙ্গার প্রতি মৃদু কটাক্ষেও স্বামীজী কেন বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

আমরা বম্বে পৌঁছলাম। ওখানকার বন্ধুরা থাকবার জন্ত আমাদের সাগ্রহ অনুরোধ করলেন। আমরা কিন্তু প্রথম ট্রেনেই কল্‌কাতা রওনা হলাম। পরদিন সকাল চারটায় ১০।১২ জন শিষ্যসহ স্বামীজী আমাদের নিতে এলেন। সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন লাল পাগড়িপরা বিশিষ্ট ভারতীয়, আমেরিকায় যাঁদের মিসেস্ ওলি বুল আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেছিলেন। তাঁরা মালা দিয়ে আমাদের অভিভূত করে ফেললেন। আমরা সত্যসত্যই ফুলে ঢাকা পড়ে গেলাম। কেউ আমাকে মালা পরিয়ে দিলে আমি ভীষণ ঘাবড়ে যাই। মিসেস্ ওলি বুল এবং আমি একটি হোটেলে উঠ্‌লাম। মিঃ মোহিনী চ্যাটার্জ্জি হোটেলে এলেন; তিনি বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকলেন। আমি বললাম, "আশা করি আপনার স্ত্রী চিন্তা করবেন না।" তিনি উত্তর দিলেন, "বাড়ী গিয়ে আমি মাকে বুঝিয়ে বল্‌ব।" ওর মানে কি আমি বুঝতে পারি নি। মিঃ চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে যখন বেশ জানাশোনা হয়ে গেছে—বোধ হয় বছর খানেক পরে—তখন তাঁকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম, "ঐ প্রথম দিন আপনি বলেছিলেন—'মাকে বুঝিয়ে বলব।' এর মানে কি?" তিনি বললেন, "ও, সে কথা! মার ঘরে গিয়ে সমস্ত দিন যা ঘটেছে সবই তাঁকে না বলে আমি রাত্রে নিজের ঘরে ঢুকি না।" কিন্তু আপনার স্ত্রী? তাঁকে সব বলেন না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, "আমার স্ত্রী? এ ঘনিষ্ঠতা তিনি তাঁর ছেলের কাছে পান।" তখনই আমি বুঝতে পারলাম ভারতীয় এবং আমাদের পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মূলীভূত পার্থক্য। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি মাতৃত্ব, আমাদের সভ্যতার ভিত্তি পত্নীত্ব—এতেই হয়েছে অভাবনীয় পার্থক্য।

দু'-এক দিনের মধ্যে বেলুড় নীলাম্বর মুখার্জ্জির বাগানবাড়ীতে আমরা

স্বামীজীকে দেখতে গেলাম। ওখানে ছিল অস্থায়ী মঠ। বিকেলের দিকে স্বামীজী বললেন, "নতুন মঠে তোমাদের নিয়ে যাব। ওটা আমরা কিনেছি।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু এ বাড়ী কি যথেষ্ট বড় নয়?" বাগান বাড়ীটি ছিল ভারী সুন্দর—ছোটখাট; বিঘে তিনেক জায়গা; একটি ছোট পুকুর ও অজস্র ফুল। আমি মনে করলাম, যে-কোন লোকের পক্ষে ঐ বাড়ীটা যথেষ্ট বড়। কিন্তু স্বামীজী সবকিছুই অন্য দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি ছোট গলির ভিতর দিয়ে আমাদের এক জায়গায় নিয়ে এলেন যেখানে বর্ত্তমান মঠ অবস্থিত। নদীতীরের পুরানো ঘরটি শূন্য দেখে মিসেস্ ওলি বুল এবং আমি বললাম, "স্বামীজী, ঘরটি আমরা ব্যবহার করতে পারি?" "এটা সারান হয়নি," স্বামীজী উত্তর দিলেন। "আমরা সারিয়ে নেব।" তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। ঘরটিকে আমরা নতুন ক'রে চুণকাম করিয়ে নিলাম। বাজারে গিয়ে মেহগনি কাঠের পুরানো সরঞ্জাম কিনে একটি বৈঠকখানা করে নিলাম। ঘরটির অর্দ্ধেক সাজান হল ভারতীয় রীতিতে, বাকি অর্দ্ধেক পাশ্চাত্ত্য রীতিতে। বাইরের দিকে ছিল আমাদের খাবার ঘর আর শোবার ঘর। অতিরিক্ত আর একখানা ঘর ছিল ভগিনী নিবেদিতার জন্য। আমাদের কাশ্মীর না যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি আমাদের অতিথি ছিলেন। পুরোপুরি দু' মাস আমরা সেখানে ছিলাম। বোধ হয় স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের ঐ সময়টাই সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য হয়েছিল। প্রতিদিন সকালবেলা তিনি চা খেতে আসতেন—বড় আমগাছের তলায় তিনি চা খেতেন। সেই গাছটি এখনও আছে। গাছটি আমরা কাটতে দিই নি। গঙ্গার ধারের বাড়ীতে আমরা বাস করছি, এতে তিনি খুশীই ছিলেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তাঁদের সকলকেই তিনি নিয়ে আসতেন। যেটাকে তিনি

বাসের অযোগ্য মনে করেছিলেন সেটাকে আমরা কি চমৎকার বাড়ী করে তুলেছি! বিকেলবেলা ঘরের সামনে আমাদের চায়ের মজলিস বসত। নদীটি ওখান থেকে ভাল করে দেখা যেত। দেখা যেত সব সময়ই মালভর্ত্তি নৌকাগুলি স্রোতের বিপরীত দিকে যাচ্ছে, আর আমরা নিজেদেরই বৈঠকখানায় যেন অতিথিদের অভ্যর্থনা করছি! যে-সব জিনিস সকলে নিতান্ত সাধারণ বলে মনে করে তাদেরও আমরা খুঁটিনাটি ব্যবহার করছি দেখে স্বামীজী আনন্দিত হতেন। একদিন রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হল—মনে হচ্ছিল যেন সব জলাকার। তিনি আমাদের খাবার ঘরের বাইরে বারাণ্ডায় পায়চারি করে কৃষ্ণ সম্বন্ধে, তাঁর প্রেম ও জগতে সেই প্রেমের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। তাঁর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল—যখন তিনি ভক্ত, প্রেমিক, তখন কর্ম্মযোগ রাজযোগ ও জ্ঞানযোগকে একেবারে বাদ দিয়ে দিতেন; যেন সেগুলোর কোন মূল্যই নেই! আর যখন তিনি কর্ম্মযোগী তখন কর্ম্মকেই প্রধান আলোচ্য করে তুলতেন। জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক তাই-ই। কখনও কখনও তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটি বিশেষ ভাবে থাকতেন; একটু আগে যে ভাবে ছিলেন তার দিকে একেবারেই ভ্রূক্ষেপ নেই! মনে হত চিত্তের একটি বিস্ময়কর একাগ্রতাশক্তিতে তিনি পূর্ণ; মনে হত যে মহান্ বিশ্বাত্মক ভাবরাশি আমাদের চারিদিকে বিরাজ করছে, সেগুলির প্রকাশন-শক্তিতে তিনি ভরপূর! ঐ একাগ্রতাশক্তিই বোধ হয় তাঁকে এত সতেজ, এত কর্ম্মচঞ্চল করে রাখ্‌ত। মনে হত তিনি কোন কিছুর অনুবৃত্তি করছেন না, সবই যেন তাঁর নিকট নিত্য নবাকারে প্রতিভাত। একটি সাধারণ ঘটনা—যার বিশেষ মূল্য নেই—তাও তাঁর নিকট নূতন পথ উদ্ভাসিত করে দিত। তাঁর নিকট পাশ্চাত্ত্যবাসী আমাদের একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদা ছিল; আমাদের তিনি বলতেন 'জীবন্ত

বেদান্তী'। তিনি বলতেন, "তোমরা কোন কিছু সত্য বলে যদি বিশ্বাস কর তবে তা কর, সে সম্বন্ধে তোমরা স্বপ্ন দেখো না। ঐটিই তোমাদের শক্তি।"

এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে স্বামীজী সিংহলের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অনাগারিক ধর্মপালকে আমাদের কাছে নিয়ে আসেন। মিসেস্ ওলি বুল, ভগিনী নিবেদিতা আর আমি ঐ ঘরে এত স্বচ্ছন্দে বাস করছিলাম যে স্বামীজী বিশেষ গৌরবের সহিত তাঁর অতিথিদের দেখাতেন—পাশ্চাত্য মেয়েরা কি রকম সহজ অনাড়ম্বর ভাবে বাস করে সত্যিকার একটি গৃহপরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

১২ই মে, ১৮৯৮ আমরা কাশ্মীরের পথে যাত্রা করলাম। আমরা নৈনিতালে নাবলাম, নৈনিতাল যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেন্টের গ্রীষ্মাবাস। সেখানে শত শত ভারতীয় তাঁর সঙ্গে দেখা করত। তারা তাঁকে একটি ঘোড়ার ওপর বসিয়ে তাঁর সামনে ফুল ফল ইত্যাদি ছড়িয়ে দিত। খ্রীষ্ট যখন জেরুজালেম্ প্রবেশ করেন লোকরা ঠিক এই রকমই করেছিল। আমার তক্ষুণি মনে হল—তা হলে এটা একটা প্রাচ্য প্রথা।

তিন দিন আমরা একাই ছিলাম। তাঁকে আমরা একেবারে দেখতে পাই নি। আমরা একটি হোটেলে বাস করছিলাম। শেষে তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। ছোট ঘরগুলোর একটিতে আমরা ঢুকলাম। সেখানে দেখতে পেলাম তিনি বিছানার ওপর বসে আছেন, মুখখানি যেন হাসিতে মাখান! আমাদের আবার দেখে তিনি এত খুশী! তাঁকে আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম। তাঁর সম্বন্ধে আমরা কোন আগ্রহ প্রকাশ করি নি। তিনিও আমাদের উপস্থিতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি। আদর-আপ্যায়নের অনুভূতিও কারো ছিল না।

ওখান থেকে আমরা আলমোড়া রওনা হই। আলমোড়াতে স্বামীজী মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারের অতিথি হন। আমরা নিজেদের জন্ম একটি বাংলো ভাড়া করে এক মাস থাকলাম। স্বামীজী সব সময়ই আলমোড়াকে তাঁর পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের 'হিমালয় আবাস' বলে মনে করতেন, আর আশা করতেন ওখানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হবে। মিঃ সেভিয়ার মঠপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব খুব গভীরভাবে নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিদিন চায়ের মজলিসে লোকজনের এত ভিড় হতে লাগল যে তিনি উত্যক্ত হয়ে হিমালয়ের অভ্যন্তরে আরও চল্লিশ মাইল চলে যাওয়া ঠিক করলেন। এইভাবে হল মায়াবতী আশ্রম—রেলষ্টেশন থেকে ৮০ মাইল দূরে; সেখানে যাওয়ার ভাল রাস্তাও ছিল না।

আমরা যখন সেখানে ছিলাম, খবর এল মিঃ গুড্উইন্ ওটকামণ্ডে মারা গেছেন। স্বামীজী যখন খবরটি শুনলেন, তিনি অনেকক্ষণ তুষারাবৃত হিমালয়ের দিকে নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, "লোকের কাছে আমার শেষ কথাটি বলা হয়ে গেল।" তারপর তিনি সাধারণ্যে বিশেষ বক্তৃতা দেন নি।

২০ জুন আমরা আলমোড়া থেকে কাশ্মীর রওনা হই। রাওলপিণ্ডি পর্য্যন্ত ট্রেনে গেলাম। সেখানে পাশাপাশি তিনঘোড়াওয়ালা টোঙ্গা পেলাম; ঐ গুলো আমাদের টেনে নিয়ে যাবে দু'শো মাইল ওপরে কাশ্মীর পর্য্যন্ত। প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলান হলো; আমরা ঐ চমৎকার রাস্তা দিয়ে সবেগে ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। রাস্তাটি ছিল রোমানদের তৈরি যে-কোন রাস্তার মত চমৎকার। তারপর পৌঁছলাম বারামুলাতে। সেখানে পেলাম চারখানা ঘরনৌকা (house-boat)। নৌকোগুলির নাম ডুঙ্গা, প্রায় ৭০ ফুট লম্বা এবং দু'টি বিছানার

পক্ষে এবং মধ্যে একটি টানা বারাণ্ডার পক্ষে যথেষ্ট চওড়া। ওপরে মাদুরের ছাউনি। জানালার দরকার হলে মাদুর গুটোলেই হত। সমস্ত ছাদটি দিনের বেলা তুলে ফেলা যেত; সুতরাং আমরা খোলা জায়গায়ই থাকতাম, যদিও সব সময় মনে হত মাথার উপর একটি ছাদ আছে। আমাদের চারটি ডুঙ্গা ছিল; একটি মিসেস্ ওলি বুল ও আমার জন্য, একটি মিসেস্ প্যাটারসন ও ভগিনী নিবেদিতার জন্য এবং একটি স্বামীজী ও আর একজন সন্ন্যাসীর জন্য। খাবারঘরওয়ালা নৌকাও ছিল। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করবার জন্য জড় হতাম। আমরা কাশ্মীরে চার মাস ছিলাম। প্রথম তিন মাস কাটালাম ঐ সাদাসিধে ছোট নৌকার মধ্যে। সেপ্টেম্বরের পর এত ঠাণ্ডা পড়ল যে আমরা একটা সাধারণ ঘরনৌকো ভাড়া করলাম। তাতে ঠাণ্ডার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আগুনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে সত্যিকার ঘরের আরাম উপভোগ করলাম। আমরা ওখানে যে-সব বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলেছিলাম সেই সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা যথেষ্ট লিখেছেন। স্বামীজী ভোর প্রায় ৫॥০ টায় উঠে পড়তেন। তিনি ধূমপান করছেন এবং মাঝিদের সঙ্গে কথা বলছেন দেখে আমরাও উঠে পড়তাম। তারপর লম্বা দু' ঘণ্টা ধরে বেড়ানর পালা। সূর্য্যের আলো গরম হওয়া পর্য্যন্ত চলত ভ্রমণপর্ব্ব। বেড়িয়ে বেড়িয়ে স্বামীজী ভারতবর্ষের কথা বলতেন—মানবজীবননিয়ন্ত্রণে ভারতবর্ষের আদর্শ কি, ইসলাম কি করেছে, কি করে নি—ইত্যাদি আলোচনা চলত।

তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য, জনসাধারণের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে কথা বলতেন—ওসব আলোচনায় যেন ডুবে যেতেন। আমরা শুনতাম আর forget-me-not (ফরগেট্-মি-নট্) ফুলভরা মাঠের

মাঝ দিয়ে যেতাম। আমাদের মাথার ওপর পাহাড়ী পথে ফুলগুলির শোভা হলদে ও নীল রঙে যেন ফেটে বেরিয়েছে।

বারামুলা অনেকটা ভেনিসের মত। অধিকাংশ রাস্তাই খাল। আমাদের নিজেদের ছোট নৌকো ছিল। তাতেই আমরা শহর থেকে বের হতুম, আবার শহরে ফিরে যেতুম। দোকানীরা ছোট ছোট নৌকো করে আমাদের নৌকোর আশেপাশে আসত। আমরা নৌকোর রেলিং-এ ভর করে দরকারী জিনিস কিনতাম। আমাদের প্রত্যেক নৌকোর মাসিক ভাড়া মাঝির মাইনে শুদ্ধ ছিল ৩০৲। মাঝিরা নিজেদের খরচায় খাওয়া-দাওয়া করত। তারা বাপ, মা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকত। তাদের থাকবার মত একটু যায়গা থাকত নৌকোর এক কোণে। অনেকবার আমরা তাদের খাবার স্বাদ গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতাম, তাদের রান্নার ঘ্রাণ ছিল এত লোভনীয়! নৌকোটিকে স্রোতের বিপরীত দিকে টেনে নেওয়া হয়। টানবার সময় মাঝি নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে এগোয়; দাঁড় টেনেও নৌকো চালান হয়। যে-ভাবেই নৌকো চালাক না কেন তার জন্ম অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয় না। বিতস্তা নদীর উজানপথে কয়েকটি হ্রদে যাবার ইচ্ছা হলে আগের দিন রাত্রে আমাদের চাকরদের বলতাম। তারা হাঁস মুরগী তরিতরকারী ডিম মাখন ফল দুধ ইত্যাদি যোগাড় করত। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতাম নৌকোটি চলছে; এত নিঃশব্দ যে তার গতি সম্বন্ধে আমরা সব সময় সজাগ থাকতাম না। আমাদের চাকর, যেটি খাবার যোগাড় করতে আগে বেরিয়ে পড়েছিল, সে তখন সুস্বাদু খাবার নিয়ে হাজির। খাবার সে একটি ট্রে-তে করে আনল; ট্রে-টি তিনটি প্যান ধরবার পক্ষে যথেষ্ট লম্বা, আবার বেশী চওড়াও নয়। প্যানগুলোতে থাকত

সুপ, মাংস আর ভাত। ঐসব লোকের নিপুণতা ছিল বিস্ময়ের বস্তু; এ সপ্রশংস ভাব আমরা কোন দিন কাটিয়ে উঠতে পারি নি। গোঁড়া হিন্দুরা মুরগীকে পবিত্র খাদ্য মনে করে না; সেইজন্য যে-সব মুরগী আমরা কিনেছিলাম তা যে আমরা খেতে চাই একথা লোকদের বলি নি। আমরা যখন নদীর উজানপথে যাচ্ছিলাম নৌকোর নীচের দিকটায় শব্দ করছিল ৬।৭টি মুরগী। যে-সব পণ্ডিত স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাঁরা কোথেকে সেই শব্দ আসছে জানবার জন্য চারদিকে তাকাতেন। স্বামীজী জানতেন ঐগুলি নীচে লুকানো আছে; সেইজন্য তাঁর চোখের মিট মিট দৃষ্টিতে একটু আশঙ্কার ভাব ফুটে উঠল; তবুও তিনি কিছু প্রকাশ করে আমাদের অপ্রস্তুত করেন নি। পণ্ডিতরা বললেন, "স্বামীজী, এই মেয়েদের দিয়ে আপনি কি করবেন? এঁরা ত ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য।" কখনও বা কয়েকজন পাশ্চাত্ত্যবাসী এসে আমাদের বলতেন, "আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না স্বামীজী আপনাদের সম্মান দিচ্ছেন না? মাথায় পাগড়ি না পরেই তিনি আপনাদের সঙ্গে কথা বলেন।" এইভাবে পরস্পরের সভ্যতার অদ্ভুত সব বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করে হাস্য-কৌতুকে আমাদের দিন কাটত।

স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে লিখলেন। আমাদের সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়ে লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দেখতে তিনি সারদানন্দজীকে আদেশ দিলেন, স্বামীজী এদিকে সোজা কলকাতা রওনা হলেন। আমাদের পৌঁছবার পূর্ব্বেই তিনি বেলুড়ে আমাদের ঐ ছোট ঘরটিতে মঠ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। আমাদের পক্ষে ঐ বাড়ীতে আর যাওয়া সম্ভব ছিল না; তাই আমরা আরও দু'মাইল দূরে বালীতে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করলাম, পাশ্চাত্ত্যদেশে ফিরে যাবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা ওখানে ছিলাম।

মঠ-প্রতিষ্ঠার জন্য মিসেস্ ওলি বুল অনেক হাজার ডলার দিয়েছিলেন। আমার খুব অল্পই ছিল; আট শ' ডলার সঞ্চয় করতে আমার বেশ কয়েক বছর লেগেছিল। একদিন আমি স্বামীজীকে বললাম, "আমার কাছে অল্প কিছু আছে; আপনি তা কাজে লাগাতে পারেন।" তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বল কি? আছে নাকি?" আমি বললাম, "হাঁ, আছে।" "কত আছে তোমার?"—তিনি জানতে চাইলেন। আমি উত্তর দিলাম, "আট শ' ডলার।" তক্ষুণি তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাও একটা ছাপাখানা কিনে ফেল।" তিনি ছাপাখানা কিনলেন; তাতে রামকৃষ্ণ মিশন-প্রকাশিত বাংলা মাসিক-পত্র 'উদ্বোধন' বের হতে লাগল।

১৮৯৯-খ্রীঃ জুলাই মাসে স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ইংলণ্ডে আবার এলেন। সেখানে ভগিনী ক্রিশ্চিন্ আর মিসেস্ ফাঙ্ক তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ওখান থেকে তিনি আমেরিকা চলে আসেন। ঐ বছর সেপ্টেম্বরে তিনি রিজ্‌লি ম্যানরে আমাদের কাছে আসেন। এখানে আমরা তাঁর জন্য এবং তাঁর দুই জন সন্ন্যাসী গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের জন্য একটি কুটির ছেড়ে দিলাম। নিবেদিতাও সেখানে ছিলেন, মিসেস্ ওলি বুলও ছিলেন। যারা স্বামীজীকে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন তাদের নিয়ে হল দস্তুর মত এক গোষ্ঠী। তিনি আমার বোন্ মিসেস্ লেগেটকে 'মা' বলে ডাকতেন, সব সময় খাবার টেবিলে তাঁর পাশে বসতেন। স্বামীজী বিশেষ করে চকলেট্ আইসক্রীম্ পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, "আমি চকলেট্ ভালবাসি, কারণ আমিও ত চকলেট্!" একদিন আমরা ষ্ট্রবেরি (strawberry) খাচ্ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস্ করলেন, "স্বামীজী,

আপনি কি স্ট্রবেরি পছন্দ করেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "এর স্বাদ আমি কখনও নিই নি।" "আপনি কোন দিন খান্ নি! তবে এখন রোজ খাচ্ছেন কেন?" তিনি বললেন, "এর ওপর ক্রীম লাগানো আছে যে। ক্রীম লাগালে পাথরও ভাল লাগবে!"

বিকেলবেলা রিজ্‌লি ম্যানরের হলঘরে বেশ বড় একটা উনুনের পাশে বসে তিনি আলাপ-আলোচনা করতেন। একবার কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী যখন কোন বিষয়ে তাঁর মত প্রকাশ করলেন, তখন একজন মহিলা বলে উঠলেন, "স্বামীজী, আমি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত নই।" "একমত নও? তাহলে এ তোমার জন্য নয়"—তিনি উত্তর দিলেন। আর একজন বললেন, "আমি কিন্তু এ বিষয়েই আপনাকে সত্য মনে করি।" "তা হলে এটি তোমার জন্যই।" ভদ্রলোকটির মতকে চূড়ান্ত সম্মান দিলেন স্বামীজী। একদিন বিকেলের আলোচনা-সভায় দশ-বার জন শ্রোতা ছিলেন; স্বামীজী এত উচ্ছ্বসিত আবেগে বলছিলেন যে স্পষ্টই বোঝা গেল তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কোমল হয়ে সুদূরে বিসর্পিত হয়ে পড়েছে! বিকেলের পর রাত্রির অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল তখন মন্ত্রমুগ্ধ আমরা পরস্পরকে বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। এমন অভাবনীয় পূত প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানে! এরপর আমার বোন মিসেস লেগেট্ একটি ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন, নিমন্ত্রিত শ্রোতা-দের মধ্যে এক ভদ্রমহিলা—তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদিনী—কাঁদছেন। "ব্যাপার কি?" আমার বোন জিজ্ঞেস করলেন। মহিলাটি বললেন, "ইনি আমাকে অনন্ত জীবনের সন্ধান দিলেন। আমার সব শোনা হয়ে গেছে—আমি আর তাঁর কথা শুনতে চাই না।"

স্বামীজীর রিজ্‌লি ম্যানরে অবস্থানকালে আমাদের নিকট এক ভদ্র-

মহিলা চিঠি লিখলেন। তাঁকে আমরা চিনতাম না। তিনি লিখেছেন, আমাদের একমাত্র ভাই লস্ এঞ্জেলেস্-এ পীড়িত; পত্রলেখিকার আশঙ্কা সে মারা যাবে, আমাদের তা জানা দরকার। আমার বোন আমাকে বললেন, "আমার মনে হয় তোমার যাওয়া উচিত।" আমি উত্তর দিলাম, নিশ্চয়ই।" দুই ঘণ্টার মধ্যে আমি তৈরী হয়ে পরলাম; ঘোড়ার গাড়ী দরজার সামনে এসে উপস্থিত হল; চার মাইল গাড়ী হেঁকে রেলষ্টেশনে যেতে হবে। আমি যখন ঘর থেকে বেরলাম, স্বামীজী হাত তুলে একটি সংস্কৃত আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করে আমাকে বললেন, "ওখানে কয়েকটি ক্লাসের বন্দোবস্ত কর, আমিও আসব।"

আমি সোজা লস্ এঞ্জেলেস্-এ গেলাম। শহরটির প্রান্তে একটি ছোট শুভ্র পরিচ্ছন্ন কুটিরে অসুস্থ ছিল আমার ভাইটি। কুটিরটি অজস্র গোলাপে পূর্ণ। ভাইয়ের বিছানার ওপর দেখলাম স্বামী বিবেকানন্দের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি। দশ বছর ভাইটিকে আমি দেখি নি। এক ঘণ্টা তার সঙ্গে কথা বলার পর, তার অসুখ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়ে গেলে আমি গৃহকর্ত্রী মিসেস ব্লজেটের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁকে বললাম, "আমার ভাইটি ত খুবই অসুস্থ।" তিনি উত্তর দিলেন, "তা ত বটেই।" "আমার মনে হয় সে বাঁচবে না।" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, তাইই।" "সে যেন এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে—"আমি বললাম। তিনি উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" তার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, আমার ভাইয়ের বিছানার উপর যাঁর প্রতিকৃতি রয়েছে, উনি কে?" সপ্ততিবর্ষোচিত গাম্ভীর্য্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সেই বর্ষীয়সী মহিলা বললেন, "পৃথিবীতে যদি কোন ভগবান থাকেন, তবে এই ব্যক্তিই।" "তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি উত্তর দিলেন, "১৮৯৩ সালে বিশ্বধর্মসম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। যখন সেই যুবক দাঁড়িয়ে বললেন, "আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতাগণ", তখন অজ্ঞাত একটা কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে সাত হাজার লোক দাঁড়িয়ে গেল। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে দেখতে পেলাম দলে দলে মেয়েরা তাঁর কাছে আসবার জন্য বেঞ্চগুলি ডিঙিয়ে যাচ্ছেন। আমি মনে মনে নিজেকে বললাম, 'তুমি যদি এই দুর্দম ভাবোচ্ছ্বাস সামলে নিতে পার তা হলে তুমি নিশ্চয়ই একজন দেবতা'।" তখন আমি মিসেস্ ব্লজেট্‌কে বললাম, "আমি তাঁকে চিনি।" "আপনি তাঁকে জানেন ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আমি উত্তর দিলাম, "হাঁ, নিউ ইয়র্কের ক্যাট্‌সকিল পর্বতে রিজলি একটি ছোট গ্রাম। গ্রামটিতে দু'শ লোকের বাস। ওখানে আমি তাঁকে রেখে এসেছি।" তিনি আবার বললেন, "আপনি তাঁকে জানেন ?" আমি জিজ্ঞেস্ করলাম, "তাঁকে এখানে আসতে অনুরোধ করেন না কেন ?" তিনি সবিস্ময়ে বললেন, "আমার কুটিরে আসতে বলব ?" "তিনি নিশ্চয়ই আসবেন"—আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম। তিন সপ্তাহের মধ্যে আমার ভাই মারা গেল; ছয় সপ্তাহের মধ্যে স্বামীজী ওখানে এলেন; তিনি তাঁর ক্লাস আরম্ভ করলেন প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থিত ক্যালিফোর্নিয়ায়।

আমরা কয়েক মাস মিসেস্ ব্লজেটের অতিথি ছিলাম। তাঁর ছোট বাড়ীটিতে ছিল তিনটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি খাবার ঘর, আর একটি বৈঠকখানা। প্রতিদিন সকালবেলা আমরা শুনতাম স্বামীজী স্নানের ঘরে সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করছেন। স্নানের ঘর ছিল রান্নাঘর থেকে একটু দূরে। তিনি উস্কখুস্ক চুল নিয়ে বেরিয়ে প্রাতরাশের জন্য তৈরী হতেন। মিসেস্ ব্লজেট্ উপাদেয় কেক্ তৈরী করতেন; রান্নাঘরের টেবিলে

তা আমরা খেতাম; স্বামীজী আমাদের সঙ্গে বসতেন। মিসেস্ ব্লজেটের সঙ্গে তাঁর কত আলোচনাই হত, কতই না কথা কাটাকাটি, কতই না হাস্ত-কৌতুক! মিসেস্ ব্লজেট বলতেন পুরুষদের বদমায়েসী বুদ্ধির কথা, আর স্বামীজী পাল্টা বলতেন মেয়েদের আরও বেশী দুষ্টুমির কথা! মিসেস্ ব্লজেট স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে বড় একটা যেতেন না; তিনি বলতেন, "আপনারা ফিরে এলে আপনাদের উপাদেয় তৃপ্তিকর খাবার দেওয়াই আমার কাজ।" স্বামীজী অনেকবার হোম অব্ ট্রুথ-এ এবং অন্যান্য হলে অনেকগুলো বক্তৃতা দেন, কিন্তু 'ন্যাজারেথের যীশু' সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন তা আমি জীবনে যে-সকল বক্তৃতা শুনেছি তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ঐ বক্তৃতার সময় মনে হত যেন তাঁর আপাদমস্তক একটি শুভ্র জ্যোতি বিকিরণ করছে, খ্রীষ্টের বিস্ময়বিমিশ্র ভাবানুধ্যানে ও মহিমাকীর্ত্তনে তিনি এত তন্ময় ও বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন! আমি ঐ বিস্পষ্ট জ্যোতিতে এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে ফেরবার পথে তাঁকে কিছুই বলি নি, ভয় ছিল পাছে তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়। আমার বোধ হচ্ছিল তখনও ঐ মহান্ খ্রীষ্টবিষয়ক ভাবরাশি তাঁর অন্তরে বিরাজমান। হঠাৎ তিনি আমাকে বললেন, "আমি জানি এটা কি ভাবে তৈরী হয়!" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি ভাবে কী তৈরী হয়?" "কি ভাবে তারা মালিগাটনি সুপ তৈরী করে, তা আমি জানি। তাতে তারা লাল রঙের একটি পাতা মিশিয়ে দেয়"—তিনি বললেন। আত্ম-সচেতনতা ও আত্মগৌরববোধের ঐকান্তিক অভাব ছিল তাঁর উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম। তিনি যেন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি সামর্থ্য ও গৌরব চোখে দেখতে পেতেন; যেই তাঁর নিকট সংস্পর্শে আসত, সেই যেন অনুভব করত সাহস বল ও বীর্য্যের অনুপ্রবেশ, আর

ফিরে যেত সতেজ সঞ্জীবিত হয়ে—নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। যখনই কোন লোক আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, "আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন কি?" তখনই আমি বলেছি, "কোন পূতচরিত্র সাধুব্যক্তির সান্নিধ্য মানুষের মধ্যে যে সাহস উদ্দীপিত করে তাই আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন।" স্বামীজী বলতেন, "ত্রাণকর্ত্তা যাঁরা তাঁরা তাঁদের শিষ্যদের পাপতাপ বিপদ-বিপর্যায় নিজের ওপর নিয়ে তাদের স্বাধীন সানন্দ ভাবে বিচরণ করতে দেবেন। সাধারণ মানুষ ও মহাপুরুষদের মধ্যে এই হল পার্থক্য। ভার বহন করবেন পরিত্রাতা দেবমানবগণ।"

রিজ্‌লি ম্যানরে তিনি আর একটি কথা আমার বোন্‌কে বলেছিলেন, "য়্যালবার্টা, জীবনে যা কিছু তুমি কল্পনা কর, বাস্তব কোন কিছুই তার সমকক্ষ হবে না।"

একদিন মিসেস ব্লজেট্ স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করাবার জন্য তিন জন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আসেন। আমি তৎক্ষণাৎ স্বামীজীর নিকট থেকে চলে গেলাম, যাতে নবাগতাদের সঙ্গে তিনি নিভৃতে আলাপ করতে পারেন। আধ ঘণ্টা পরে তিনি এসে আমাকে বললেন, "এই মহিলারা হচ্ছেন তিন বোন। তাঁদের ইচ্ছা আমি প্যাসাডেনায় তাঁদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করি।" আমি বললাম, "যান।" তিনি বললেন, "সত্যই যাব কি?" "হাঁ যান"—আমি আবার বললাম। তাঁরা ছিলেন মিসেস হ্যান্সবরো, মিস্ মিড্ ও মিসেস্ ওয়াইকফ্। মিসেস ওয়াইকফের বাড়ী এখন হয়েছে হলিউডের 'বিবেকানন্দ ভবন'। মিসেস ওয়াইকফ এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন এখন সেখানে আছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার য়্যালামেডা থেকে তিনি ১৮ই এপ্রিল, ১৯০০ সালে আমার নিকট একখানা চিঠি লেখেন। আমার মনে হয় তাঁর সব

চিঠির মধ্যে ঐটিই সব চেয়ে সুন্দর। চিঠিখানি রয়েছে 'Inspired Talks' (দেববাণী)-এর সর্ব্বশেষে।

পরে ১৯০০ সনে আমার বোন ও মিঃ লেগেট প্যারিসে একটি বাড়ী ভাড়া করেন। আমরা ওখানে যাই জুন মাসে; স্বামীজী এলেন আগষ্ট মাসে। তিনি কয়েক সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। শেষে তিনি চলে যান অবিবাহিত মিঃ জেরাল্ড নোবেল-এর নিকট। পরে স্বামীজী মিঃ নোবেলের সম্বন্ধে বলেছিলেন, "মিঃ নোবেলের মত লোকের সঙ্গে বন্ধুতা করবার জন্য জন্মগ্রহণ করা পরম সৌভাগ্যের কথা।" আমাদের এই বন্ধুকে তিনি এত বেশী সম্মান দিতেন। এই ছ'মাসের মধ্যে আমরা স্বামীজীকে অনেক আপ্যায়িত করেছি। স্বামীজী প্রায় প্রতি-দিনই দুপুরে খেতে আসতেন।

একদিন প্যারিসে লাঞ্চ খাবার সময় গায়িকা মাদাম্ এমা কাল্ভে বললেন, শীতের সময়টা তিনি মিশর যাবেন। আমি যখন তাঁর সঙ্গে যাবার প্রস্তাব করলাম তক্ষুণি তিনি স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার অতিথি হিসেবে আপনি কি মিশরে আসবেন?" তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। আমরা ভিয়েনা, কনষ্টান্টিনোপল ও এথেন্স হয়ে মিশরে গেলাম। আমরা ছিলাম ভিয়েনাতে দু'দিন, কনষ্টান্টিনোপ্ল-এ ন'দিন, এথেন্স-এ চার দিন। ওখানে পৌঁছে কয়েকদিন পরে স্বামীজী বললেন, "আমি চলে যেতে চাই।" "চলে যাবেন? কোথায় যাবেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "ভারতবর্ষে ফিরে যাব"—তিনি উত্তর দিলেন। আমি বললাম, "আচ্ছা যান।" "যেতে পারি ত?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। "নিশ্চয়ই"—আবার আমি উত্তর দিলাম। আমি মাদাম কাল্ভের নিকট গিয়ে বললাম, "স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চান।"

তিনি বললেন, "যাবেন বৈ কি।" তিনি তাঁর জন্ম প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিলেন। স্বামীজী দেশে সময় মতই পৌঁছেছিলেন। পৌঁছে শুনতে পেলেন মিঃ সেভিয়ারের মৃত্যুসংবাদ। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিঠি দিয়ে জানালেন—লিখলেন কি অপূর্ব্ব প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে মিসেস সেভিয়ার তাঁর স্বামীর দেহত্যাগকে গ্রহণ করেছিলেন! তিনি মায়াবতী আশ্রমে একই ভাবে থেকে গেলেন, যেন তাঁর স্বামী সেখানেই আছেন!

নীলনদীর উৎসপথে কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে আমার দেখা হল। চমৎকার লোক তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে জাপানে যেতে তাঁরা আমাকে অনুরোধ করলেন। সুতরাং ভারতবর্ষ হয়ে জাপানযাত্রার আমার সুযোগ হল। আবার স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, যদি তাঁর যাবার ব্যবস্থার জন্ম আমি লিখি তা হলে তিনিও জাপানে যাবেন। জাপানে আমি ওকাকুরা কাকাজুর সঙ্গে পরিচিত হই। টোকিওতে ওকাকুরা বিজিৎসুইন্ চিত্রবিষ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাপানে স্বামীজীকে অতিথি হিসেবে পাবার জন্ম বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু স্বামীজী যেতে রাজী হন নি বলে মিঃ ওকাকুরা তাঁর পরিচয়লাভ করবার জন্ম আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে এলেন। বেলুড়ে কয়েকদিন থাকার পর আমার জীবনে একটি অতি আনন্দময় মুহূর্ত্ত এল যখন মিঃ ওকাকুরা অনেকটা উৎকট অহঙ্কারে আমাকে বললেন, "স্বামী বিবেকানন্দ ত আমাদেরই। তিনি একজন প্রাচ্যবাসী। তিনি আপনাদের নন।" তখন আমি বুঝতে পারলাম তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সত্যিকারের ভাবসাম্য হয়েছে। দু'-এক দিন পরে স্বামীজী আমাকে বললেন, "মনে হচ্ছে যেন বহু দিনের হারান একটি ভাই এসেছে।" তাঁর কথায় ধরা পড়ল

তাঁদের দু'জনের যথার্থ মনের মিল। তারপর স্বামীজী যখন তাঁকে জিজ্ঞেস্ করলেন, "আপনি কি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন?"

মিঃ ওকাকুরা উত্তর দিলেন, "না, এই সংসারের সঙ্গে বোঝাপড়া এখনও আমার চুকে যায় নি।" তাঁর উত্তরটি অতি বিজ্ঞোচিত!

ঐ বছর গরমে আমেরিকার কন্সাল-জেনারেল জেনারেল প্যাটারসন ওঁদের কনসুলেট্-এ (Consulate) আমাকে থাকতে দিলেন। সেখানে অতিথি ছিলেন মিঃ ওডা। টোকিওর আসাকুসা মন্দিরে আমি তাঁর অতিথি হয়েছিলাম।

সমস্ত বছর প্রায়ই আমি স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতাম। একদিন এপ্রিল মাসে তিনি বললেন, "জগতে আমার কিছুই নেই। নিজের বলতে আমার এক পেনিও নেই। আমাকে যখন যা কেউ দিয়েছে তার সবই আমি বিলিয়ে দিয়েছি।" আমি বললাম, "স্বামীজী, যতদিন আপনি বেঁচে থাকবেন ততদিন আমি আপনাকে প্রতি মাসে পঞ্চাশ ডলার দেব।" তিনি মিনিটখানেক ভেবে বললেন, "তাতে কি আমি কুলিয়ে নিতে পারব?" "হাঁ, নিশ্চয়ই পারবেন। অবশ্য তাতে বোধ হয় আপনার ক্রীম-এর ব্যবস্থা হবে না।" আমি উত্তর দিলাম। আমি তখনই তাঁকে দু'শ ডলার দেই, কিন্তু চার মাস যেতে না যেতেই তিনি ইহসংসার থেকে চলেই গেলেন!

একদিন বেলুড় মঠে কোন ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় ভগিনী নিবেদিতা পুরস্কার বিতরণ করছিলেন; আমি স্বামীজীর শোবার ঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম; সেই সময় তিনি আমাকে বললেন, "আমি কখ্খনো চল্লিশে পৌঁছব না।" তাঁর বয়স ছিল উনচল্লিশ—তা আমি জানতাম। আমি বললাম, "কিন্তু স্বামীজী, বুদ্ধ চল্লিশ থেকে আশী বছরের

আগে ত তাঁর জীবনের বড় কাজ করেন নি।" তিনি বললেন, "আমার যা বাণী তা আমি দিয়েছি। এখন আমাকে যেতেই হবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন যাবেন ?" তিনি উত্তর দিলেন, "বড় গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বড় হতে দেবে না। ছোটদের জন্য স্থান করবার জন্য আমাকে যেতেই হবে।"

তারপর আমি আবার হিমালয় গেলাম। আমি স্বামীজীকে আর দেখতে পাই নি। রাজার জুবিলি উপলক্ষে আমি ইউরোপে ফিরে গেলাম। পূর্ব্বেই বলেছি আমি কখনও তাঁর শিষ্যা ছিলাম না, ছিলাম শুধু বন্ধু। ১৯০২, এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার সময় তাঁর কাছে শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম, "সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে আমি আপনার সঙ্গেই থাকব।" এই লেখার পর আমি তাঁকে আর দেখি নি। বিদায়কালীন পত্রে আমার পরিষ্কার মনে পড়ে আমি ঐ কথা লিখেছিলাম। কথাটি তিনবার পড়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি যা লিখেছি সত্যিই কি তা মনে করি ?" হাঁ, সত্যিই তা আমার মনোগত ভাব। যাই হোক, আমি ইউরোপে রওনা হলাম। চিঠিখানা তিনি পেয়েছিলেন, অবশ্য আমি কোন উত্তর পাই নি। তিনি ১৯০২, ৪ঠা জুলাই দেহত্যাগ করেন।

২রা জুলাই ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করেন। কোন একটি বিজ্ঞান তাঁর বিদ্যালয়ে পড়াবেন কিনা জানতে তিনি স্বামীজীর কাছে গিয়েছিলেন। স্বামীজী উত্তর দিলেন, "বোধ হয় এ বিষয়ে তুমিই ঠিক ; আমার মন কিন্তু অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত। আমি পরপারের জন্য তৈরী হচ্ছি।" নিবেদিতা ভাবলেন স্বামীজী বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। স্বামীজী তাঁকে বললেন, "তোমাকে ত খেয়ে যেতে হবে।" ভগিনী নিবেদিতা সব সময়েই হিন্দু ধরণে আঙ্গুল দিয়ে খেতেন। তাঁর

খাওয়া হয়ে গেলে স্বামীজী তাঁর হাতে জল ঢেলে দিলেন। সত্যিকার শিষ্যের মত নিবেদিতা বললেন, "আপনার এরূপ করা আমার ভাল লাগছে না।" তিনি উত্তর দিলেন, "যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।" "তাঁদের শেষ সাক্ষাতের সময় ঐরূপ হয়েছিল"—ভগিনী নিবেদিতা কথাটি একরকম বলতে যাচ্ছিলেন। ঐটিই ছিল তাঁর স্বামীজীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার। সেদিন স্বামীজী তাঁর কাছে আমার কথা বলেছিলেন, অন্যান্য অনেকের কথা বলেছিলেন। আমার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "সে পবিত্রতার মতই পবিত্র—যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা। মূর্ত্ত ভালবাসার মতই সে ভালবাসে।" সুতরাং ঐ কথাকেই আমার প্রতি স্বামীজীর শেষ বাণীরূপে আমি গ্রহণ করেছিলাম। দুদিনের মধ্যেই তিনি মহাপ্রস্থান করলেন। বলে গেলেন, "এই বেলুড়ে যে ঘনীভূত আধ্যাত্মিকতার চাপ এল, তা থাকবে পনর শ' বছর। এ হবে এক সুবৃহৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়। আমি কল্পনা করছি মনে কর না, আমি তা প্রত্যক্ষ দেখছি।"

৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠ থেকে আমাকে ক্যাব্‌ল-এ খবর দেওয়া হল, "স্বামীজী নির্ব্বাণলাভ করেছেন।" কয়েকদিন আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম। ক্যাব্‌ল-এর আমি কোন উত্তর দিই নি। বিমর্ষের ঘনান্ধকারে আমার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠল; তাতে কয়েক বছর কাঁদলাম। ম্যাটারলিঙ্ক্ পড়বার পর আমি আর চোখের জল ফেলি নি। ম্যাটারলিঙ্ক্ বলেছেন, "তুমি যদি কারো দ্বারা সত্যিই প্রভাবিত হয়ে থাক, তাহলে তোমার জীবনে তা প্রমাণ কর, চোখের জলে নয়।" আমি আমেরিকা ফিরে গিয়ে যে-সব জায়গায় স্বামীজী ছিলেন তার অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি 'সহস্র দ্বীপোদ্যানে' (Thousand Island Park) গেলাম; সেখানে গৃহকর্ত্রী

মিস্ ডাচারের অতিথি হলাম। স্বামীজী যে ঘর ব্যবহার করতেন সেই ঘরে তিনি আমাকে থাকতে দিলেন।

চৌদ্দ বছর কেটে যাবার পর আমি ভারতবর্ষে ফিরলাম। সেবার আমি প্রোফেসার গেড্স্ ও মিসেস গেড্স্-এর সঙ্গে গিয়েছিলাম। তখন আমি দেখতে পেলাম ভারতবর্ষ ত নিরানন্দ নৈরাশ্যের দেশ নয়! সারা ভারতবর্ষ স্বামীজীর ভাবে উদ্দীপিত; ছ'-সাতটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হাজার হাজার কেন্দ্র হয়েছে, শত শত সমিতি দেখা দিয়েছে! ঐ সময় থেকে আমি ঘনঘনই ভারতবর্ষে গিয়েছি। সন্ন্যাসীরা আমাকে বেলুড় মঠের অতিথিশালায় পেতে চান। আমি স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁদের সামনে প্রাণবন্ত করে ধরি কিনা! এই যুবকরা ত তাঁকে কখনও দেখেন নি। আমিও ভারতবর্ষে থাকতে চাই। মনে পড়ে যখন স্বামীজীকে একদিন জিজ্ঞেস্ করেছিলাম, "স্বামীজী, আমি কিভাবে আপনাকে সব চেয়ে বেশী সহায়তা করতে পারি?" তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "ভারতবর্ষকে ভালবাস।" সুতরাং ভারতবর্ষেই আমি থাকতে চাই। বেলুড় মঠের অতিথিশালার দোতলা আমারই। হয়ত প্রত্যেক বছর শীতকালে ওখানে যাব জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত।

স্বামীজীর কথা

আমি নিজে অবশ্য বেদের ততটুকু মানি, যতটুকু যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদের অনেক অংশ ত স্পষ্টতঃই স্ববিরোধী! Inspired বা প্রত্যাদিষ্ট বললে পাশ্চাত্ত্যদেশে যেরূপ বুঝায়, বেদকে আমাদের শাস্ত্রে সেরূপভাবে প্রত্যাদিষ্ট বলে না। তবে উহা কি? না, ভগবানের সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি। এই জ্ঞানসমষ্টি যুগারম্ভে প্রকাশিত বা ব্যক্ত ও যুগাবসানে সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। যুগের আরম্ভ হলে উহা আবার প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রের এই কথাগুলি অবশ্য ঠিক, কিন্তু কেবল 'বেদ' নামধেয় গ্রন্থগুলিই এই জ্ঞানসমষ্টি, এ কথা মনকে আঁখিঠারা মাত্র। মনু এক স্থলে বলেছেন, বেদের যে অংশ যুক্তির সঙ্গে মেলে তাই বেদ, অপরাংশ বেদ নয়। আমাদের অনেক দার্শনিকেরও এই মত।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে, তার মোদ্দাটা এই যে তাতে ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের স্থান নেই। আমরা আনন্দের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে খুব প্রস্তুত আছি।

বেদান্তের প্রথম কথা হচ্ছে, সংসার দুঃখময়, শোকের আগার, অনিত্য ইত্যাদি। বেদান্ত প্রথমঃ খুললেই দুঃখ দুঃখ শুনে লোক অস্থির হয়, কিন্তু তার শেষে পরম সুখ—যথার্থ সুখের কথা পাওয়া যায়। বিষয়-জগৎ, ইন্দ্রিয়-জগৎ থেকে যে যথার্থ সুখ হতে পারে, এ কথা আমরা অস্বীকার করি, আর বলি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই যথার্থ সুখ। আর এই

সুখ, এই আনন্দ সব মানুষের ভিতরই আছে। আমরা জগতে যে 'সুখবাদ' দেখ্‌তে পাই, যে মতে বলে জগৎটা পরম সুখের স্থান, তাতে মানুষকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ কোরে সর্ব্বনাশের দিকে নিয়ে যাবে।

আমাদের দর্শনে ত্যাগের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বাস্তবিক ত্যাগ ব্যতীত আমাদের কোন দর্শনেরই লক্ষ্য বস্তু পাওয়া অসম্ভব। কারণ ত্যাগ মানেই হচ্ছে আসল সত্য যে আত্মা, তার প্রকাশের সাহায্য করা। উহা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়, তার উদ্দেশ্য এই যে, সে সত্য-জগতের জ্ঞান লাভ কর্‌তে চায়, অথবা জগতের যথার্থ স্বরূপ কি তা জানতে চায়।

জগতে যত শাস্ত্র আছে, তার মধ্যে বেদই কেবল বলেন যে, বেদ পাঠ করাটাও অপরা বিদ্যার সীমার ভিতর। পরা বিদ্যা হচ্ছে, যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। সে পড়ে হয় না, বিশ্বাস করে হয় না, তর্ক করেও হয় না, সমাধি-অবস্থা লাভ করলে তবে সেই পরমপুরুষকে জানা যায়।

জ্ঞানলাভ হলে আর সাম্প্রদায়িকতা থাকে না; তা বলে জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে যে ঘৃণা করেন তা নয়। তিনি সকল সম্প্রদায়ের অতীত ব্রহ্মকে জেনে সব সম্প্রদায়ের অতীত অবস্থায় পৌঁছেন ও উহাতে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তিনি সম্প্রদায়সকলকে ভেঙ্গেচুরে ফেল্‌তে চেষ্টা করেন না, কিন্তু তাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেন। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে ও এক হয়ে যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদায়, সব মতেই জ্ঞান লাভ হয়, তখন আর কোন মতভেদ থাকে না।

জ্ঞানী বলেন, সংসার ত্যাগ কর্‌তে হবে। তার মানে এ নয় যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ভাসিয়ে বনে চলে যেতে হবে। প্রকৃত ত্যাগ হচ্ছে সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা।

মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম কেন হয়? পুনঃ পুনঃ শরীর-ধারণে দেহ-মনের বিকাশ হবার সুবিধে হয়, আর ভিতরের ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ হতে থাকে।

বেদান্ত মানুষের বিচার-শক্তিকে যথেষ্ট আদর করে থাকেন বটে, কিন্তু আবার এও বলেন যে, যুক্তি-বিচারের চেয়েও বড় জিনিস আছে। যুক্তি-বিচারের সহায়তায় ওদের সীমার বাইরে যেতে হবে ও সেই জিনিস লাভ করতে হবে।

ভক্তিলাভ কিরূপে হয়?

—ভক্তি তোমার ভেতরেই আছে, কেবল তার ওপর কামকাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে রয়েছে, তা সরিয়ে ফেল্‌লেই ভক্তি আপনা আপনি প্রকাশ হবে।

জিব চল্‌লেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় চল্‌বে।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম—এই চার রাস্তা দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে-পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে কর্ম্মযোগের ওপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে।

ধর্ম্ম একটা কল্পনার জিনিস নয়, প্রত্যক্ষ জিনিস। যে একটা ভূতও দেখেছে, সে অনেক বই-পড়া পণ্ডিতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এক সময়ে স্বামীজী কোন লোকের খুব প্রশংসা করেন, তাতে তাঁর নিকটস্থ জনৈক ব্যক্তি বলেন, "কিন্তু সে আপনাকে মানে না।" তাতে তিনি বলে উঠ্‌লেন, "আমাকে মান্‌তে হবে, এমন কিছু লেখা-পড়া আছে? সে ভাল কাজ কর্‌ছে, এই জন্যে সে প্রশংসার পাত্র।"

আসল ধর্ম্মের রাজ্য যেখানে, সেখানে লেখাপড়ার প্রবেশের কোন অধিকার নেই।

কেউ কেউ বলেন, আগে সাধন-ভজন কোরে সিদ্ধ হও, তার পর কর্ম্ম কর্‌বার অধিকার; কেউ কেউ বা বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম্ম কর্‌তে হবে। এর সামঞ্জস্য কোথায়?

—তোমরা দুটো জিনিস গোল করে ফেল্‌ছো। কর্ম্ম মানে, এক জীব-সেবা আর এক প্রচার। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধপুরুষ ছাড়া কারু অধিকার নেই। সেবায় কিন্তু সকলের অধিকার; শুধু অধিকার নয়, সেবা করতে সকলে বাধ্য, যতক্ষণ তারা অপরের সেবা নিচ্ছে।

ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভেতর যেদিন থেকে বড় লোকের খাতির আরম্ভ হবে, সেই দিন থেকে তার পতনের আরম্ভ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ভাবের (feelings) যেরূপ বিকাশ হয়েছিল, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

অসৎ কর্ম্ম করতে ইচ্ছা হয়, গুরুজনের সাম্‌নে করবে।

গোঁড়ামি দ্বারা খুব শীঘ্র ধর্ম্ম-প্রচার হয় বটে, কিন্তু সকলকে মতের

স্বাধীনতা দিয়ে একটা উচ্চপথে তুলে দেওয়াতে দেরি হলেও পাকা ধর্ম্ম-প্রচার হয়।

সাধনের জন্য যদি শরীর যায়, গেলই বা।

সাধুসঙ্গে থাক্‌তে থাক্‌তেই ধর্ম্মলাভ হয়ে যাবে।

গুরুর আশীর্ব্বাদে শিষ্য না পড়েও পণ্ডিত হয়ে যায়।

গুরু কাকে বলা যায়?

—যিনি তোমার অন্তরের পুঞ্জীকৃত সংস্কার-রাশি দেখ্‌তে পান এবং তারা ভূতকালে তোমাকে কি ভাবে নিয়মিত করেছে এবং ভবিষ্যতে কোন্ দিকে চালাবে অর্থাৎ তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু।

আচার্য্য যে-সে হতে পারেন না, কিন্তু মুক্ত অনেকে হতে পারে। মুক্ত যে, তার কাছে সমুদয় জগৎ স্বপ্নবৎ, কিন্তু আচার্য্যকে উভয় অবস্থার মাঝখানে থাক্‌তে হয়। তাঁর জগৎকে সত্য জ্ঞান করা চাই, না হলে তিনি কেন উপদেশ দেবেন? আর যদি তাঁর স্বপ্নজ্ঞান না হলো, তবে তিনি ত সাধারণ লোকের মত হয়ে গেলেন, তিনি কি শিক্ষা দেবেন? আচার্য্যকে শিষ্যের পাপের ভার নিতে হয়। তাতেই শক্তিমান আচার্য্যদের শরীরে ব্যাধি-আধি হয়। কিন্তু কাঁচা হলে তাঁর মনকে পর্য্যন্ত তারা আক্রমণ করে, তিনি পড়ে যান। আচার্য্য যে-সে হতে পারেন না।

এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটী কোটী ধ্যানের চেয়ে বড় বলে বুঝতে পারবে।